মনোজ বসুর

'বৃষ্টি, বৃষ্টি !' উপন্যাস অবলম্বনে

ডাকবাংলো

দেবনারায়ণ গুপ্ত

নাটকায়িত

স্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় : ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৬৫ (১২ই মার্চ, ১৯৫৯)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুর্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

দুই টাকা পঁচিশ ন. প.

সংগঠকবৃন্দ

প্রযোজনা : সলিলকুমার মিত্র

কাহিনী : মনোজ বসু

নাট্যরূপ ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্যসজ্জা ও আলোক-সম্পাত : অনিল বসু

গীতিকার : শৈলেন রায়

সুরকার : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নৃত্য-পরিচালনা : মিতা চট্টোপাধ্যায়

স্মারক : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সত্য সরকার

যন্ত্রীসঙ্ঘ : কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিশ্বনাথ কুণ্ডু ; মুরারি রায় চৌধুরী ; জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শচীন বসু ; ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় ; পরেশ বসাক

আলোক-সজ্জা : অজিত শাউ ; বৃহস্পৎ সিং ; ভানু মুখোপাধ্যায় ; বৈদ্যনাথ সেন ; জলধর দাস ; কানাইলাল ধর ; মণীন্দ্রনাথ দে ; মণীন্দ্রনাথ ঘোষ

মঞ্চ-মায়াকর : অনিল দাস ; ভগীরথ মিস্ত্রি ; ভূষণ সামন্ত ; বিজয় চিত্রকর ; বলাই অধিকারী ; যুগল গুঁই ; কার্তিক কর্মকার ; মণীন্দ্রনাথ দাস ; রামদাস দাস ; শশীভূষণ দাস ; সন্তোষ সরকার

শব্দ-প্রক্ষেপণ : দুলাল মল্লিক

চরিত্র-লিপি ও প্রথম অভিনয়ের অভিনেতৃবৃন্দ

বিশ্বেশ্বর সরকার—ছবি বিশ্বাস

অম্বুজাক্ষ রায়—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণাক্ষ—আশিসকুমার

কৃতান্ত বিশ্বাস—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চানন সরখেল—অনুপকুমার

গোবিন্দভূষণ ঘোষ—তুলসী চক্রবর্তী

পটল—শ্যাম লাহা

সতীশ মোড়ল—চন্দ্রশেখর

সহদেব—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

হরিহর—পঞ্চানন ভট্টাচার্য

দীপক ও রামনিধির ছায়ামূর্তি—প্রেমাংশু বসু

প্রতুল দত্ত ও কাশীশ্বরের ছায়ামূর্তি—শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিতোষ—রাজা মুখোপাধ্যায়

ভট্টাচার্য—শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত

চক্রবর্তী—মণি মজুমদার (এ্যাঃ)

প্রকাশ—শৈলেন মুখোপাধ্যায়

কাগজওয়ালা—শান্তি দাসগুপ্ত

জনৈক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি—পতাকী মুখোপাধ্যায়

ড্রাইভার—অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সরমা—অপর্ণা দেবী

ইরাবতী—সন্ধ্যা রায়

সুহাসিনী—সাধনা রায়চৌধুরী

ভবতারিণী—গীতা দে

সুনন্দা—মিতা চট্টোপাধ্যায়

সাবিত্রী—শৈলবালা

শোভা—প্রভাবতী জানা

আভা—গৌরী চক্রবর্তী

কৃষ্ণা—কৃষ্ণা সিংহ

বেবী—সূর্যা মিত্র

মাধুরী—কণিকা ঘোষ

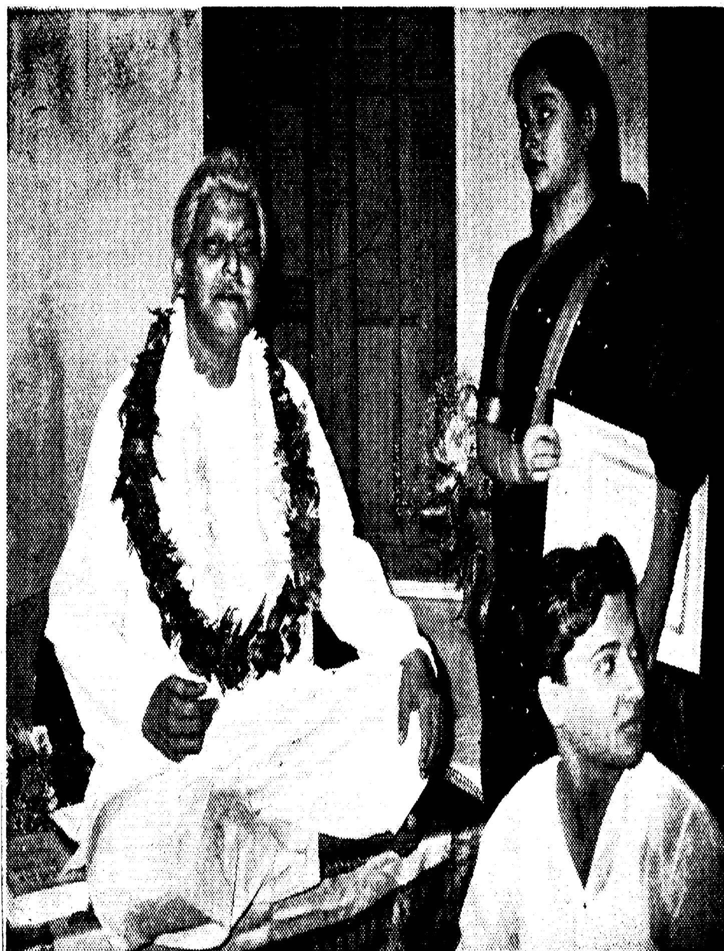
বৈষ্ণবী—গীতশ্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

কিশোরীবালা—ভারতী

অন্যান্য ভূমিকায়: প্রীতি মজুমদার, লক্ষ্মীজনার্দন, নকুল দত্ত, পঙ্কজ ভট্টাচার্য (এ্যাঃ), অজয় সিংহ (এ্যাঃ), শান্তিগোপাল, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শোভেন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সাহা, রামকৃষ্ণ, বিশ্বনাথ, কানু চক্রবর্তী বিষ্ণু সেন, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক মিত্র, শৈলেন ভট্টাচার্য, দিলীপ, রাম ভট্টাচার্য।



লাইব্রেরি। বিশ্বেশ্বর, ইরা, কৃতান্ত ও পঞ্চানন (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)



সভা। বিশ্বেশ্বর, ইরা ও অরুণাক্ষ (১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরিষ্কার আকাশ। মেঘ উঠল। গভীর কালো মেঘ। সহসা ঝড়-জল ও বৃষ্টি এলো। পথে একটি মেয়েকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। ঝড়-জলের মাঝে অন্ধকারে সে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। একটা বাড়ির সম্মুখে এসে সে ঘন ঘন কড়া নাড়ে ও কলিং-বেল টিপতে থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায়ের বাড়ি। অরুণাক্ষের পড়ার ঘর।

অরুণ পড়াশুনা করছিল। দরজা খুলতে খুলতে বিরক্তভাবে বলে—

অরুণ। দাঁড়া, দাঁড়া—খুলছি। আচ্ছা হরিহর, সেই কখন গিয়েছিলি, আর এখন ফেরার সময় হল?

দরজা খুলে ইরাকে দেখে বিস্মিত হল।

ইরা। আঃ! কি করছেন? জলে ঘর ভরে গেল যে!

অরুণ দরজা বন্ধ না করে ইরার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অরুণ। আপনি?

ইরা। ভয় নেই, মানুষ। দেখছেন কি? দরজাটা বন্ধ করুন।

অরুণ যুবক। ইরার কথার উপরে সে খিল আঁটতে ইতস্তত করছিল। তাই দেখে ইরাই দরজা বন্ধ করে দেয়। অরুণ টেবিল-ল্যাম্প নিভিয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দেখল, ইরা একদম ভিজে গেছে। ইরার অবস্থা দেখে সে শিউরে উঠে বলে—

অরুণ। ইস্! বড্ড ভিজে গেছেন যে!

ইরা। নাঃ—এ আর বেশি কি!

অরুণ। একেবারে নেয়ে উঠেছেন, আর বলছেন বেশি নয়?

ইরা। কী আর করা যাবে? কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি।

অরুণ। (লজ্জিত ভাবে) মানে, ব্যাপারটা কি জানেন, বাড়িতে কেউ নেই কিনা! হরিহর হতভাগা এই আসছি বলে, সেই যে কখন বেরিয়েছে, এখনো দেখা নেই। বক্সের পরেই আমার একটা একজামিন, তাই তদ্গত হয়ে পড়াশুনো করছিলাম।...জলে কাদায় কী অবস্থা হয়েছে আপনার! আচ্ছা, আমি এখুনি আস্‌ছি—

অরুণ চলে গেল।

ঘরটি সুসজ্জিত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির গৃহ—সহজেই বোঝা যায়। একটি ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর ইতিহাসের বই খোলা। ইরা বইখানা নাড়াচাড়া করে দেখছিল। ইতিমধ্যে অরুণ ধুতি হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

অরুণ। নাঃ, ধুতি ছাড়া পাওয়া গেল না। মা-বাবা দেশে গেছেন, মায়ের শাড়িটাড়ি মা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। আলমারিও বন্ধ। হরিহর থাকলে হয়তো কোন হদিস্‌ হত। সেই বেলা চারটের সময় এক বোতল কেরোসিন কিনতে বেরিয়েছে, এখনও দেখা নেই।

ইরা। বৃষ্টিতে কোথাও বোধহয় আটকে গেছে।

অরুণ। না না, বৃষ্টির ছুতোয় নিশ্চয়ই কোথাও আড্ডা জমিয়েছে। মাকে তাই বলেছিলাম, সবসুদ্ধ দেশে চললে—এটাকেই বা ফেলে যাচ্ছ কেন? যাক গে—

সুইচ টিপে দালানের আলো জ্বেলে দিল।

বাড়িতে কেউ নেই—সোজা চলে যান ঐদিকে। কাপড়টা পাল্টে এসে বসুন। বৃষ্টি কখন থামবে, কে জানে?

ইরা। শাড়ির যা দশা হয়েছে! সত্যি, না বদলালে উপায় নেই।

অরুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, যান—বদলে আসুন।

ইরা ধুতিখানা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অরুণ ইজি-চেয়ারে বসে। খোলা বইটা বন্ধ করে পাশের ছোট টেবিলে রেখে দেয়। আবার উঠে দাঁড়ায়। শেষে ঘরের ভিতরকার দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে যায়। ইতিমধ্যে ইরা ফিনফিনে কালা-পাড় ধুতি পরে ঘরে প্রবেশ করে। নিজের শাড়িটা নিংড়ে এনে টেবিলের একপাশে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘর থেকে অরুণও প্রবেশ করে। ইরা অরুণকে বলে—

ইরা। একটা ছাতা পেলে চলে যেতাম।

অরুণ। ছাতা না হয় পেলেন। কিন্তু এ বৃষ্টি তো ছাতায় মানাবে না।

ইরা। রাত হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরি থেকে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যাব। আমার জন্যে বসে আছেন। আমার বাবা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। আপনিও তো ইতিহাসে এম.এ. দিচ্ছেন, অরুণাক্ষ বাবু?

অরুণ। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

ইরা মুখ টিপে হাসে, জবাব দেয় না।

ও! বুঝতে পেরেছি। বই-এ লেখা নামটা দেখেছেন। ইতিহাসের ছাত্র তা-ও টের পেয়েছেন ঐ বই থেকে। আমার বাবার নামটাও বোধহয় জেনে ফেলেছেন ফটকের নেম-প্লেট থেকে—

ইরা। হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। নাম বললে, আমার বাবাকেও হয় তো আপনি জানবেন। পলাশির যুদ্ধ থেকে স্বাধীন ভারত—এই দুশো বছর নিয়ে রিসার্চ করছেন। মাস চারেক হল এক ভল্যুম বইও বেরিয়েছে।

অরুণ। বটে! কি নাম বলুন তো আপনার বাবার?

ইরা। শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার—

অরুণ। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি বৈ কি! আপনার বাবাকে বলবেন, আমি তাঁর পরম ভক্ত।

ইরা। বাবার লেখাও বহু কাগজে বেরোয়। যুগচক্রের প্রায় প্রতি সংখ্যায় বাবার লেখা থাকে।

অরুণ। [বিরক্তভাবে] যুগচক্র? ও একটা জঘন্য কাগজ।··· কিন্তু আপনার বাবার লেখা আমি বিস্তর পড়েছি। অনেক জিনিষ বোধহয় মুখস্থও বলতে পারি। তা যাক—বসুন, আমি চা করে আনি।

ইরা। [বাধা দিয়ে] না না, চায়ের দরকার নেই।

অরুণ। নিশ্চয়ই দরকার। শীতে কাঁপছেন আপনি। হিটারে জল চাপিয়ে দিয়ে এসেছি।

প্রস্থানোদ্যত। পুনরায় ফিরে বলে—

জানেন? সমস্ত পারি আমি। হরিহরকে নিয়ে আছি, বুঝতে পারছেন না? আপনি ততক্ষণ বসে বসে কাগজটা উল্টান।

খবরের কাগজ এগিয়ে দিয়ে চলে যায়। ইরা বসে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে থাকে। একটা টি-পট আর দুটো কাপ হাতে করে অরুণ বেরিয়ে আসে। একটা কাপে চা ঢেলে ইরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—

কত তাড়াতাড়ি করে চা আনলাম দেখুন। কেমন হয়েছে বলুন?

ইরা। এখনো মুখ দিই নি—

ইরার কথায় অরুণ লজ্জিত হয়। ইরা হেসে চায়ে চুমুক দেয়। মুখ বিকৃত করে বলে—

বাঃ! খাসা, চমৎকার!

অরুণ। [নিজের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে] বুঝলেন, রান্নাবান্না সমস্ত আমার রপ্ত। হরিহরের জ্বালায় পড়ে এই তিন হপ্তায় আরো ভাল করে শিখে ফেলেছি। [চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে] আচ্ছা, চা কি আপনার নোনতা নোনতা লাগছে?

ইরা। কৈ না তো!

অরুণ। [আর একবার চায়ে চুমুক দিয়ে] হুঁ! নুনই পড়েছে, তাই আপনি খাচ্ছেন না। খালি ঠোঁট ঠেকাচ্ছেন। আসছি—

[পাশের ঘরে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলে]

যা ভেবেছি, তাই—

ইরা। কি?

অরুণ। চিনি ভেবে নুনই দিয়েছি। চিনি যে কোথায় রেখে গেছে হতভাগা—

ইরা। দেখুন, নুন-চায়েরই আমার দরকার ছিল। ঠাণ্ডায় সর্দি লাগবে না।

অরুণ। নাঃ, বদনাম হয়ে গেল আপনার কাছে। কেমন চা তৈরি করি, দেখাতে পারলাম না।

ইরা দরজা খুলে বাইরের অবস্থা দেখে নিয়ে বলে—

ইরা। আচ্ছা, আমি চলি এবার।

ইরা শাড়িটা নিতে যায়। অরুণ বাধা দিয়ে বলে—

অরুণ। ওটা থাকুক। লাইব্রেরিতে ভিজে শাড়ি হাতে করে যাবেন কেমন করে? ...দাঁড়ান, দাঁড়ান, ছাতা দিচ্ছি। ঠিকানাটা দিয়ে যান, হরিহর আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ইরা। শাড়ি রয়ে গেল যে! ছাতা আর ধুতি আমি নিজেই দিয়ে যাব, আর সেই সঙ্গে শাড়িটাও নিয়ে যাব। হরিহরকে পাঠাতে হবে না। আচ্ছা চলি—

ইরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অরুণ ইরার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর অরুণ দরজা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে এসে বসে। পুনরায় কড়া নড়ে ওঠে।

অরুণ। [বিরক্তভাবে] নাঃ, জ্বালালে! পড়াশুনা আর করতে দেবে না।

দরজা খুলে হরিহরকে দেখতে পেল।

সেই কখন গিয়েছিলি এক বোতল কেরোসিন কিনতে, এখন ফেরার সময় হল?

হরিহর। কি করব, যা নম্বা নাইন! তার ওপর ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। একে কেরোসিন মেলে না, তাতে যদি জল পড়ে নষ্ট হয়ে যায়? তাই জল না থামা পর্যন্ত অপিক্ষে করতে হল—

অরুণ। যা যা—রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করগে—

হরিহরের প্রস্থান। অরুণ এসে চেয়ারে বসে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কড়া নড়ে ওঠে।

অরুণ। দুত্তোর ছাই! জ্বালিয়ে মারলে! হরিহর—হরিহর—

হরিহরের প্রবেশ।

দেখ্, কে কড়া নাড়ে—

হরিহর দরজা খুলে সুনন্দাকে দেখে মুখ ব্যাজার করে।

অরুণ। সুনন্দা, তুমি হঠাৎ অসময়ে?

সুনন্দা। মা পাঠালেন। বাবা বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনাদের দেশের বাড়ির ঠিকানাটা নিতে এলাম।

অরুণ। ঠিকানা নিতে হবে না। তোমার মাকে বলো, বাবাকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য।

সুনন্দা। ও!...তা করেছিলেন কি?

হরিহর। পড়াশুনা করছিলেন।

সুনন্দা। তা হলে আর বিরক্ত করব না। আমি তা হলে আসি—

হরিহর। আসুন—

সুনন্দা হরিহরের প্রতি কটাক্ষ করে চলে যায়। হরিহর দরজা বন্ধ করে।

অরুণ। তুই বাড়ি থাকলেও জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা। সব কথায় তোর কথা কওয়া আছে।

হরিহর। কেন? আমি আবার কি করলাম?

অরুণ। লোকজন বাড়িতে এলে 'আসুন' 'বসুন' বলতে হয়, জানিস নে ?

হরিহর। বললাম ত! উনি বললেন 'আসি তা হলে', আমি বললাম—'আসুন'।

অরুণ। খুব হয়েছে—আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না।

হরিহর। তা মুখ্যু মানুষ—যেমন বুঝি, তেমন বলি। তবে যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা চলছে, ছুঁতোয় নাতায়-দুম-দুম করে তাকে আসতে দেখলে গা আমার জ্বলে যায়। তা তুমি যাই বলো—

হরিহর চলে গেল। অরুণ বিরক্তভাবে সেইদিকে চেয়ে থাকে।

তৃতীয় দৃশ্য

লাইব্রেরি। বড় হলঘরের পাশে একটি ছোট কুঠুরি। কুঠুরির র‍্যাকগুলো বইয়ে ঠাসা। টেবিলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে মোটা মোটা বই ও পুঁথি-পত্র ছড়ানো। তারই মধ্যে বসে আছেন বিশ্বেশ্বর। গায়ে আধ-ময়লা পাঞ্জাবি, পরনে পাড়হীন ধুতি। জামার তুলনায় ধুতিটা বেশি রকম ফরসা। বিশ্বেশ্বর একটা বই খুলে নোট নিলেন একটুখানি, তারপর সেটা বন্ধ করে খুললেন আর একটা বই। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করতে রাজি নন। এইভাবে যখন কাজে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় পাশের হলঘর থেকে পরিতোষ হাজরা, দীপক বটব্যাল ও আরও কয়েকজন যুবক এলো। বিশ্বেশ্বর তাদের দিকে চাইবারও অবসর পেলেন না। যুবকদের মধ্যে জন দুই গুটি গুটি টেবিলের পাশে ঘিরে দাঁড়াল। বিশ্বেশ্বরের চমক ভাঙে। চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

বিশ্বেশ্বর। কি হে! কি বলছ তোমরা ?

পরিতোষ। আজ্ঞে, পুরানো কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছি। সুতোনুটিতেই তো হেস্টিংস থাকতেন ?

বিশ্বেশ্বর। [দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে] হ্যাঁ, সুতোনুটির হাটে তাঁতের কাপড় বেচত হেস্টিংস—বসাক আর শেঠেরা কিনত।

যত সব অকাট-মুর্খের দল। বোঝ কাণ্ড! হেস্টিংস-এর ঘর জেনে বসে আছে সুতোনুটিতে।...ওহে ছোকরারা, তোমাদের বাপ-দাদারা হয়তো হেস্টিংস ষ্ট্রীটে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আস্তাবলবাড়িতে দশটা—পাঁচটা আপিস করে এখনও তোমাদের পড়াশুনার খরচ যোগাচ্ছেন। বুঝেছ?

বলতে বলতে বিশ্বেশ্বর উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। এই সময়ে ইরাবতী প্রবেশ করল।

ইরা। বাবা!

দীপক। জোব চার্নক আর হেষ্টিংস বন্ধুলোক ছিলেন? না?

বিশ্বেশ্বর। বটেই তো! যেমন বন্ধুত্ব ছিল রামায়ণের লক্ষ্মণে আর মহাভারতের অর্জুনে! ঝান্সির রাণী আর রাণী ভবানীতে। মরি, মরি! বিদ্যের বহর দেখে তাজ্জব বনে যাই! যত সব—

ইরা। বাবা!

বিশ্বেশ্বর। কে? ও, ইরা?

ইরা। চলো বাবা—

বিশ্বেশ্বর। এখন কি রে, এই সন্ধ্যেবেলা?

ইরা। সন্ধ্যে ছিল তিন ঘণ্টা আগে। নাও, ওঠো—

পরিতোষ। অতি চমৎকার বোঝাচ্ছেন।

দীপক। বিস্তর শিক্ষা হচ্ছে—

অন্য একটি যুবক। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা—

আরও একজন। দয়া করে কথাগুলো শেষ করতে দিন।

ইরা। আর নয়, এখন বাবা বাড়ি যাবেন। প্রশ্নগুলো কাল অবধি যদি মনে থাকে, তাহলে কাল এসে না হয় বুঝে নেবেন। আর, আমি এসে পড়বার আগেই সেটা সেরে নেবেন।

এই সময়ে যুগচক্রের সম্পাদক কৃতান্ত বিশ্বাস এবং তাঁর সহকারী পঞ্চানন ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়ল। পঞ্চাননের হাতে চাঁদা আদায়ের রশিদ-বই, প্রুফের বাণ্ডিল, আর

কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকা। কৃতান্তের চেয়ে পঞ্চানন বয়সে অনেক ছোট। কৃতান্তর মাথার চুলে পাক ধরেছে। খদ্দরের ধুতি-চাদর তার পরনে। মুখে গাম্ভীর্য, চোখেমুখে ব্যবসা-বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।

কৃতান্ত। (যুবকদের লক্ষ্য করে) বলি, ভায়ারা তো ভক্তিতে বেসামাল! মুখের বাক্য গব-গব করে গিলে খাচ্ছেন। এমন ভক্ত যখন আপনারা, কিছু চাঁদা ছাড়ুন দিকি! দাদার সম্বর্ধনা-সভা হচ্ছে। পঞ্চানন, যে যা দেবেন, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রসিদ কেটে দাও। এমন কথা না ওঠে যে, দশের পয়সা আমরা মেরে দিয়েছি।

পঞ্চানন রশিদ-বই আর কলম নিয়ে তৈরি।

পঞ্চানন। আসুন, কে কি দিচ্ছেন বলুন তো—

রশিদ-বই বের করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সরে পড়ল। দীপক ও পরিতোষ পকেটে হাত দিয়ে অপ্রস্তুতভাবে একজন ছয় আনা আর একজন আট আনা বের করল।

পঞ্চানন। আপনার নাম?

পরিতোষ। পরিতোষ হাজরা—

পঞ্চানন। দিচ্ছেন কত?

পরিতোষ। আট আনা।

পঞ্চানন। মাত্র? (দীপকের দিকে চেয়ে)—আপনার নাম?

দীপক। দীপক বটব্যাল—

পঞ্চানন। কত লিখব?

দীপক। লিখুন, ছ আনা।

পঞ্চানন। আট আর ছয় চোদ্দ আনা। পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা! তাই সই—(রসিদ কেটে) আসুন।

উভয়ের চাঁদা নিয়ে রসিদ দিল। বেকুবের মতো যুবকদ্বয় পালিয়ে বাঁচল। কৃতান্ত বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে—

কৃতান্ত। দাদা, আপনার জন্মদিন বারোই আষাঢ় তো?

বিশ্বেশ্বর। এ্যাঁ ?...কার জন্মদিন...কবে ?

পঞ্চানন। আপনার। মানে, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে জন্মদিনে আপনাকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে যে! কাউন্সিলার ভূতনাথ গুঁই মহাশয়ের পৌরোহিত্যে য়্যুনিভারসিটি ইন্সটিট্যুটে মহতী সভা।

বিশ্বেশ্বর। সভা—সভা কেন ?

পঞ্চানন। বাঃ রে!...'ভারতে ইংরাজ' লিখে দেশের কত বড় কাজ করলেন—সেই জন্যে সম্বর্ধনা-সভা।

বিশ্বেশ্বর। (এক গাল হেসে) 'ভারতে ইংরাজ' লোকে খুব ভাল বলছে বুঝি ?

পঞ্চানন। বলবে না ? দেখবেন সম্বর্ধনার দিন ইনিয়ে-বিনিয়ে কি পরিমাণ বক্তৃতা দেবে। কত কবিতা লিখে নিয়ে এসে অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে পাঠ করবে।

বিশ্বেশ্বর। আমি জানতাম। খাতার পাতায় কলম ছুঁইয়েই বুঝতে পারি, কি দরের জিনিষ বেরুবে। তোমরা কিন্তু গোড়ায় ভরসা করতে পার নি। তা-না না-না করে বিস্তর দিন কাটালে। নইলে 'ভারতে ইংরাজ' এতদিন কবে বেরিয়ে পুরনো হয়ে যেত।

কৃতান্ত। খরচের হিসেব কষে, দাদা, আগুপিছু করেছি। মবলগ টাকার দরকার। তাই কর্পোরেশনের ইলেকসন অবধি সবুর করতে হল। তা দাদা, দেরিই হোক আর যাই হোক, ঐ ঢাউস বইটা বের তো করে ফেললাম শেষ পর্যন্ত।

ইরা। তা সত্যি। দেশে কত ধনী-মানী আছেন। গবর্নমেণ্ট আছে, নামজাদা প্রকাশকরা আছে। কাউকে পাওয়া গেল না। আপনিই কেবল এগিয়ে এলেন কাকাবাবু।

কৃতান্ত। জিনিষ চিনি বলেই বই ছাপিয়েছি। আবার সম্বর্ধনারও

যোগাড় করেছি। ইরা মা, এ তুমি বুঝবে না। সম্বর্ধনা না করে হতভাগা কৃতান্তের উপায় নেই। তাতে বউ-ছেলেপুলে উপোসি থাক, আর ছাপাখানাটা বন্ধকই পড়ুক।

পঞ্চানন। বিনয় করে বলা নয়, হবে তাই নির্ঘাৎ। ছাপাখানাটা যাবে এবার।

কৃতান্ত। যায়—যাকগে। এসেমব্লির বড় ইলেকসন সামনে। কৃতান্ত আর ডরায় না।···তৈরি হতে লাগুন দাদা, 'ভারতে ইংরাজের' দ্বিতীয় খণ্ডটা বের করার মতলব রাখি ঐ এসেমব্লির মওকায়। তা যাক, আপনার সঠিক জন্ম-তারিখটা বলে দিন দাদা—সেইমত হল ভাড়া করব, কার্ড ছাপাব। আমি তো বারোই আষাঢ় বলেই জানি।

বিশ্বেশ্বর। (চিন্তিত ভাবে) তারিখটা বারোই কিনা, তুই বলতে পারিস ইরা?

ইরা ঘাড় নাড়ে।

বিশ্বেশ্বর। উঁ-হুঁ-হুঁ, আন্দাজি ঘাড় নাড়া নয়। তোর মা হিসেব রাখে। তাকে জিজ্ঞাসা করে নিস, সে হয়তো সঠিক বলবে।

কৃতান্ত। (হেসে) সে কি দাদা! যত মরা মানুষের জন্ম-তারিখ কণ্ঠস্থ, আর নিজের বেলায় গড়বড়?

বিশ্বেশ্বর। বাজে জিনিষ আমি মাথায় রাখিনে কৃতান্ত। আমার জন্ম-তারিখ আমার কোন্ কাজে আসবে?

কৃতান্ত। কাজে আসবে না তো এদ্দূর হাঁটতে হাঁটতে এলাম কেন শুনি? ইরা মা, তোমার উপর ভার। বৌদির কাছ থেকে তারিখটা জেনে নেবে।

পঞ্চানন। (ইরার প্রতি) সম্বর্ধনা-কমিটিতে তোমাকেও নেওয়া হয়েছে ইরা। রবিবারে যুগচক্র-অফিসে কমিটির মিটিং।

ইরা। বাবাকে নিয়ে ব্যাপার। বাবার সম্বর্ধনা-কমিটির মধ্যে আমার থাকা বোধহয় ঠিক হবে না পঞ্চানন-দা। আমি যাব না।

কৃতান্ত। তোমার হলেন বাবা। আমিও ওঁকে বড় ভাই বলে মান্য করি। তবে তো আমাকেও হাত গুটিয়ে বসতে হয়। ঘরের মানুষ বলে দামের ঠিক আন্দাজ নিতে পার না মা। বাংলার ইতিহাসের যে একটু খবর রাখে, সেই দাদাকে মাথায় তুলে নাচবে।

বিশ্বেশ্বর। মাথায় তুলে নাচবে—হেঁ-হেঁ—শুনছিস রে ইরা? ভাল করে শুনে নে, তোর মাকে গিয়ে বলবি, সে মোটে বিশ্বাস করে না। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যাবতীয় নাগরিকের পক্ষ থেকে সভা—চাট্টিখানি ব্যাপার?

ইরা। (বাপের কথায় লজ্জিত হয়) এবারে তুমি চলো বাবা। কত রাত হয়ে গেছে, ওঠো—

ইরা খাতাপত্র গোছাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। ইরা তাড়া দিচ্ছে। তাহলে এখন আসি কৃতান্ত—

কৃতান্ত। আসুন দাদা—

ইরা ও বিশ্বেশ্বর চলে গেলেন।

পঞ্চানন। (বিরক্তমুখে) শনি আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই শিক্ষা হয় না? 'ভারতে ইংরাজ' এদ্দিনে পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হল না, তাই নিয়ে আবার সম্বর্ধনা!

কৃতান্ত। (হেসে) আরে বাপু কানে জল ঢুকলে আরও জল ঢুকিয়ে জল বার করতে হয়। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে মবলগ খরচ—এ হল সভার নামে হৈ-চৈ করে, পয়সায় কুলোলো তো খান দুই করে সিঙ্গাড়া খাইয়ে, নিখরচায় খবরের কাগজে কলম-জোড়া বিজ্ঞাপন বাগিয়ে নেওয়া।

পঞ্চানন। নিখরচায়! কি বলছেন আপনি? হলের ভাড়া কত পড়বে জানেন? তারপর মালা আছে, মাইক আছে—

কৃতান্ত। (নিরুদ্বেগে) আহা, সে তো আর আমরা দিতে যাচ্ছি নে। পাবই বা কোথা?

পঞ্চানন। তা হলে কে দেবে শুনি?

রাগে গরগর করতে করতে পকেট থেকে রশিদ-বই বের করল।

এই তো একটু আগে পরিতোষ হাজরা আট আনা আর দীপক বটব্যাল ছ' আনা—একুনে চোদ্দ আনা…দুই ভক্তে মিলে পুরো টাকাটাও হল না—

কৃতান্ত। যদ্দুর হয় হোক না এমনি। তারপর গৌরী সেন রয়েছে। ইনস্টিট্যুটের মতো জায়গায় গলায় ফুলের মালা চড়িয়ে সভাপতিত্ব করবে ভূতনাথ গুঁই—আর টাকা দিতে যাবে কি রাস্তার লোক? ভেবো না পঞ্চানন, প্রকাশকে পাঠিয়েছি ভূতনাথের কাছে। এইখানেই তাকে আসতে বলেছি।…ঐ যে বলতে বলতেই। খবর কি প্রকাশ?

প্রকাশ প্রবেশ করল।

প্রকাশ। এই দিয়েছে—

কৃতান্ত। মাত্র পাঁচ টাকা! বলো কি?

প্রকাশ। বললেন, কাউন্সিলার হয়ে অবধি বিস্তর জায়গায় দিতে হচ্ছে। এর বেশি হয়ে উঠবে না।

কৃতান্ত। হুঁ, কাউন্সিলার করলে কে শুনি? কলির ধর্ম! এক মাঘে শীত চলে গেল, এই ভেবেছে? ইলেকসন আবার আসবে না? পাঁচ টাকা দেবে তো গুঁইয়ের মতো গাছ-মুখ্যুকে সভাপতি করতে যাব কেন? বাংলা দেশে কি গুণী-জ্ঞানীর অভাব আছে?

পঞ্চানন। নেই তা তো বুঝলাম। কিন্তু সম্বর্ধনার কি হবে?

কৃতান্ত। হবে। আলবৎ হবে। কথা যখন হয়ে গেছে, তখন দাদার বাড়ির ঐ উঠোনটুকুতেই হবে। ইরা মেয়েটার কাছে গিয়ে এখন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হবে, ভক্তেরা নাছোড়বান্দা। বলছে—গঙ্গার ধারা দেখে সুখ হয় না, গঙ্গোত্রীও দেখব। দাদার লেখার উদ্গম যে পুণ্যস্থান থেকে।

পঞ্চানন। এই সমস্ত ব্লাফ দেবেন ওদের কাছে গিয়ে?

কৃতান্ত। উপায় কি? ব্লাফ মনে করলেই ব্লাফ। এই তো চলছে আজকাল।

চতুর্থ দৃশ্য

ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায়ের বাড়ি। অরুণের পড়ার ঘর। ইরা সরাসরি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। হরিহর ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে। ইরার হাতে ছাতি, ও খবরের কাগজে-মোড়া ধুতি। ইরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই হরিহর কটমট করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকাল, পরে হাত নেড়ে বলে—

হরিহর। নেই, মফঃস্বলে চলে গেছেন।

ইরা। কলকাতা শহরেই নেই?

হরিহর। না গো, তবে আর বলছি কি?

ইরা। আচ্ছা, এই ছাতি আর ধুতিটা বাবুকে দিয়ো।

হরিহর। তা নাম-ঠিকানা নিখে রেখে যাও—

ইরা। নাম লিখতে হবে না। এই দুটো পেলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

হরিহর। না না, সেটা ঠিক হবে না। তুমি বাপু নামটা নিখে রেখে যাও, নইলে আমার ওপর এসে রাগ করবেন। যত রুগি আসছে, সবাই নিকে নিকে যাচ্ছে। তুমি যদি বাপু নতুন রুগি হও, তাহলে নেক কি রোগে ভুগছ—

ইরা। (সবিস্ময়ে) রোগ?

হরিহর। হ্যাঁ গো—

ইরা। আমি রোগি নই। ডাক্তার বাবু নয়, অরুণাক্ষ বাবুকে চাই আমি। মানে ডাক্তার বাবুর ছেলে—বুঝলে?

হরিহর। ও, তাই বলো! আমি ভাবছি বুঝি ডাক্তারবাবুকে চাইছ। তা দাদাবাবু এখানে আছে। এই তো এক্ষুণি ভবানীপুরে গেল।

ইরা। তুমি তো হরিহর?

হরিহর। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো কই তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

ইরা। আর একদিন এসে পড়েছিলাম, তুমি তখন ছিলে না। তোমার দাদাবাবু—মানে অরুণাক্ষবাবু—তোমার ভীষণ প্রশংসা করছিলেন।

হরিহর। অনেক কালের নোক কিনা আমি। দাদাবাবুকে তো প্রায় হাতে ধরে মানুষ করলাম।

ইরা। তাই বলো! সেইজন্যে তোমার দাদাবাবু সেদিন অমন করে বলছিলেন।

আবর্জনার ঝুড়ি থেকে ইরা একখানা খাতা তুলে নিল।

কলেজের প্রফেসার নোট দিয়েছেন—এ জিনিস ঝুড়ির মধ্যে কেন হরিহর?

হরিহর। দরকারি না কি?

ইরা। হ্যাঁ, দরকারি বৈ কি!

হরিহর। তা আমি জানব কি করে? তাকের নিচে জঞ্জালের মধ্যে পড়ে ছিল। উনুনে দেব বলে নিয়ে যাচ্ছি।

ইরা। (হেসে) দিলে অবশ্য তোমার দাদাবাবু বেঁচে যান। পড়াশুনার দায় থাকে না।

হরিহর। উঁ-হু, সে কথাটি কেউ বলতে পারবে না। টপাটপ পাশ করে যায় দাদাবাবু, কখ্খনো ফেল হয় না! বড্ড ভাল ছেলে, বেস্তর গুণ।

ইরা। কেবল এই যা একটু অগোছালো। তুমি আছ হরিহর তাই, নৈলে যে কি হত—

হরিহর। এই দেখ না, ডাক্তার বাবু গিন্নিমা কবে এসে পড়েন, তাই হুকুম হয়ে গেল, নিচের ঘরগুলো আজকের মধ্যে সাফাই করে ফেল তুমি বল দিদি, একটা দিনে এত-সমস্ত হয়।

ইরা। ঠিকই তো! (ঝুলঝাড়াটা তুলে) দাঁড়াও হরিহর, আমি একটু সাফ করে দি?

ইরা মাকড়সার জাল ভাঙছে, হরিহর হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

হরিহর। না না না, তুমি কেন গো, তোমায় কে করতে বলছে? আমিই পারব, দাও দাও—

ইরা। আমি একটুখানি না হয় করে দিলাম হরিহর-দা। এ তো মেয়েদেরই কাজ। কোন্‌টা দরকারি, কোন্‌টা বেদরকারি, তুমি তো জান না—

হরিহর। তা হোক, আমি থাকতে এ কাজ কি তোমায় করতে দিতে পারি?

ইরা। তাতে কি? তোমার কাজ একটু এগিয়ে দিলে আমি তো আর ক্ষয়ে যাব না হরিহর-দা।

ঘরের ঝুল ঝাড়তে লাগল।

হরিহর-দা, অরুণবাবুকে এই ছাতা আর ধুতি-কাপড়টা দেবে। আর এখানে আমার একখানা শাড়ি আছে—দাও দিকি, নিয়ে যাই।

হরিহর। ও! সে বুঝি তোমার শাড়ি? দাদাবাবুর কাণ্ড! দেখলাম, পাট করে মাথার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। কাল আমি শাড়িখানা ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ। হর্ন বাজতে লাগল। হরিহর বিরক্তভাবে বলে—

দেখি, আবার কে এল। ডাক্তারবাবু ক'দিন নেই—তা রুগির একেবারে মড়ক লেগে গেছে।....কে?

কথার মাঝে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ছুটে এলো সুনন্দা। মাজা-ঘসা-ঝকঝকে মুখ, চটকদার পোষাক। মেয়েটি হরিহরকে জিজ্ঞাসা করল—

সুনন্দা। ডাক্তারবাবু ফেরেন নি এখনো?

হরিহর। না।

সুনন্দা। অরুণবাবু কোথায়?

হরিহর। তিনিও বাড়ি নেই।

সুনন্দা। শোন, অরুণবাবু এলে বলবে যে সুনন্দা এসেছিল। বুধবার সন্ধ্যায় অতি অবশ্য যেন আমার মামার বাড়িতে যান। function আছে। রাত্রে সেখানেই খাবেন। ১

হরিহর। ওহো! আপনি? এইবারে চিনতে পেরেছি। দাদাবাবু তো তোমার গিয়ে, আপনার মামার বাড়িতেই গেছে। তা দাঁড়িয়ে কেন গো দিদিমণি, বসো।

সুনন্দা। না, এখন বসবার সময় নেই। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া তোমার দাদাবাবু আমাদের ওখানেই গেছেন যখন—

সুনন্দা যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল।

ইরা। ইনি?

হরিহর। দাদাবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে গো! নাচুনে মেয়ে—ধিতিং-ধিতিং করে নাচে। মা সেইজন্যে মুখ সিঁটকান। কিন্তু মেয়ের

বাপ ডাক্তার বাবুর ছেলেবয়সের বন্ধু। চিকিচ্ছের জন্যে কলকাতায় এসে এখন মেয়েটাকে গছাবার তালে আছেন। রোগ-টোগ আমার মিছে মনে হয়। বাড়িতে রুগি থাকলে অত ফুর্তি আর অমন নেমন্তন্নের ঘটা!

ইরা। ওঃ! আচ্ছা, আসি তাহলে। (ব্যাগ থেকে নিমন্ত্রণের চিঠি বের করে) আর দেখ, তোমার দাদাবাবুকে এই চিঠিটা দিও। বলো, সভায় যাবার জন্যে বিশেষ করে বলে গেছে—

হরিহর। কিন্তু নামটা তো তোমার বলে গেলে না—

ইরা। নাম বলতে হবে না, চিঠি দিলেই তোমার দাদাবাবু বুঝতে পারবেন।

ইরা বেরিয়ে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

যুগচক্র-সম্পাদক কৃতান্ত বিশ্বাসের বাড়ির বাইরের ঘর। ঘরের একদিকে তক্তপোষ পাতা। মাঝখানে খান দুই হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ার ও একটি ভাঙা টেবিল। টেবিলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বই। ঘরের এক কোণে একরাশ যুগচক্র ও নানা প্রকার সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্র। এক পাশে ভাঙা কেরোসিন-কাঠের শেলফ, তার উপর কয়েকটি অতি-পুরাতন বই ও সাময়িকপত্রাদি। কৃতান্ত বিশ্বাসের স্ত্রী ভবতারিণী এক কাগজওয়ালাকে ডেকে পুরানো যুগচক্রের গাদা এনে তার সম্মুখে রাখছে। কাগজওয়ালা ওজন করছে।

কাগজওয়ালা। (পাল্লা থেকে কাগজ নামিয়ে) পান সের। আর আছে মা?

ভবতারিণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছে বৈ কি! দাঁড়াও, দিচ্ছি।

ভবতারিণী পুরাতন যুগচক্রের গাদা থেকে আরো কতকগুলো এনে কাগজওয়ালার সামনে রাখল। কাগজওয়ালা পাল্লায় তুলছে। এই সময়ে কৃতান্ত ও পঞ্চানন ঘরে প্রবেশ করল।

কৃতান্ত। কি গো! এ কি করছ?

ভবতারিণী। কী আবার করব! ঘরের জঞ্জাল সাফ করছি।

কৃতান্ত। জঞ্জাল? কি বলছ তুমি? এ হল পুরনো কাগজের ফাইল, রেকর্ডস্—এগুলো বিক্রি করে কখনো?

ভবতারিণী। রেকর্ড! ওই জঞ্জালগুলোর জন্যে নেংটি ইঁদুরের রাজত্বি, আর তার জন্যে বালিস-বিছানাগুলো পর্যন্ত যেতে বসেছে—

কৃতান্ত। যাক—সব চুলোয় যাক। তাই বলে যা নিয়ে করে খাচ্ছি, সেগুলো বিক্রি করতে হবে নাকি? দেখ পঞ্চানন, আক্কেল দেখ একবার তোমার বৌদির—

ভবতারিণী। লোক ডেকে আর সালিশি করতে হবে না, খুব হয়েছে! (কাগজওয়ালার প্রতি) বার আনা করে সের হলে, পাঁচ সেরের দাম হল, তিন টাকা বারো আনা। দাও—

কৃতান্ত। (চোখ কপালে তুলে) কি? তিন টাকা বার আনার জন্যে সারা জীবনের শ্রম-সাধনা সব জলাঞ্জলি দিতে হবে নাকি?

ইতিমধ্যে কাগজওয়ালা যুগচক্রগুলো থলিতে ভরতে যাচ্ছিল। কৃতান্ত বাধা দিল।

খবরদার বলছি, ওগুলো থলেয় ভরবে না। নেহি বিক্রি করেঙ্গা—নিকালো হিঁয়াসে।

ভবতারিণী। আমি ওকে ডেকে এনেছি—তাই ও এয়েছে। তুমি নিকালো বলবার কে?

কৃতান্ত। আলবৎ বলব—আমি গৃহস্বামী—

ভবতারিণী। (মুখ ভেঙচে) এ্যাঁ! স্বামী হয়ে তো সব সুখেই রেখেছেন, এখন হয়েছেন আবার গৃহস্বামী!

পঞ্চানন ব্যাপার দেখে কাগজওয়ালাকে বুঝিয়ে বলে—

পঞ্চানন। যাও হে, চলে যাও। ওগুলো সব দরকারি কাগজ—

বিক্রি করা হবে না। মা তো জানেন না! তুমি যাও, অন্য কাগজ জড় হলে ডাকব।

বেগতিক দেখে কাগজওয়ালা তার দাঁড়িপাল্লা ও থলে নিয়ে প্রস্থান করল।

কৃতান্ত। দেখ, দেখ হে পঞ্চানন, শুধু দেখে যাও কি সুখে আমি সংসার করি। হীরে-মুক্তোয় যার দাম হয় না, মূর্খ স্ত্রীলোক তাই কিনা ওজন দরে সাবাড় করছিল।

ভবতারিণী। আমিও বলি, দেখে যাও ঠাকুরপো! হীরে-মুক্তো বাড়িতে গাদা করা—আর ছেলেপুলের গায়ে জামা নেই, পেট ভরে দুটো খেতে দিতে পারি নে। লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে দেখে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কি কেউ জানে যে মাথায় কাগজের পোকা ঢুকে আছে?

কৃতান্ত। বিয়ে দেওয়ার আগে তোমার বাবার ভাবা উচিত ছিল যে সংবাদপত্রসেবী মানে সাধক। অর্থকে সে পরমার্থ বলে ভাবতে পারে না।

ভবতারিণী। বুঝেছি। আর বাবাও সে কথা এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছেন।

কৃতান্ত। পারবেনই তো! বুঝলে পঞ্চানন, ওর মামা সম্বন্ধ করতে এসে বলেছিলেন মেয়ে নাচতে পারে, গাইতে পারে, লেখাপড়া জানে, —আরো কত কি! (ভবতারিণীকে দেখিয়ে) এই চেহারা দেখে নাচ-গানের কথা তুমি ভাবতে পার? Can you imagine that once upon a time she was a dancer and songstress?

পঞ্চানন। অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটে যায় বৈ কি! তবে বৌদি যে এককালে নাচতে বা গাইতে—

কৃতান্ত। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আমি হলপ করে বলতে

পারি পঞ্চানন, কখ্খনোও নাচতে গাইতে পারত না। ও সব বাজে কথা। ওদের ফ্যামিলিতে কেউ নাচ-গান জানে না।

ভবতারিণী। খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো। ফ্যামিলি তুলে কথা বলো না। আমার ফ্যামিলি ছিল, তাই এখনো ছাপাখানার চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছ। (কেঁদে) বাবা এক-গা গয়না দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার হাতে পড়েই তো এক এক করে সব গেল।

কাঁদতে লাগল।

পঞ্চানন। ছিঃ বৌদি, চোখের জল ফেলবেন না। অভাব-অনটন আর কোন সংসারে নেই ? গয়না গেছে, আবার হবে।

কৃতান্ত। হবে মানে ? হয়েছে already। কর্পোরেসন-ইলেকসনে চার গাছা চুড়ি হয়নি ?

পঞ্চানন। বৌদি, বারো মাস আমরা যুগচক্রের সলতে জ্বালিয়ে যাচ্ছি, ইলেকসনের সময় খাণ্ডব-দাহন করব বলে। যান বৌদি, এক কাপ চা নিয়ে আসুন—

ভবতারিণীর প্রস্থান

উঃ! ইলেকসন যদি মাসে একটা করে হত দাদা—

কৃতান্ত। সেই তো হওয়া উচিত। জনগণের মত যত ঘন ঘন যাচাই হবে, ততই এসে পড়বে খাঁটি গণতন্ত্র। আর সেই সঙ্গে আমাদেরও দুটো পয়সা হয়। আসছে সংখ্যায় তুমি একখানা জ্বালাময়ী লেখো তো এই নিয়ে—সরকারের সুবুদ্ধি হোক।

পঞ্চানন। বুঝলেন দাদা, এসেমব্লি-ইলেকসনে শুনছি ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায় দাঁড়াবে এবার। শাঁসালো মানুষ—বড় টার্গেট আমাদের—

কৃতান্ত। তা ছাড়া কাশীশ্বরের রায়ের নাতি। সেই কলঙ্ক ধোবার জন্যে আসতেই হবে আমাদের কাছে। সে যাক গে…এখন মাথায়-

ঘুরছে—বিশ্বেশ্বরের সম্বর্ধনা। দু-মাসে পঞ্চাশ কপিও 'ভারতে ইংরাজ" নড়ানো গেল না!

পঞ্চানন। ইরা যখন ভার নিয়েছে, তাদের উঠানে হচ্ছে—তখন আর ভাবনা কি দাদা! ওঃ, আপনার কথা বলার যা কায়দা! দু-কথায় মেয়েটাকে একেবারে মাতিয়ে দিলেন!

কৃতান্ত। নিমন্ত্রণ-চিঠি কত ছাড়লে? মানে, মহতী সভা বলে রিপোর্ট দিতে হবে—জন চল্লিশ মানুষ অন্তত হওয়া চাই।

পঞ্চানন। হয়ে যাবে। ঘাবড়াবেন না। প্রকাশকে দিয়ে আমরা ঢালাও চিঠি বিলি করেছি। ইরাও নিয়ে গেছে গোছাখানেক।

ভবতারিণী ভাঙা কাপে পঞ্চাননের জন্য এবং কলাই-ওঠা গেলাসে কৃতান্তর জন্য চা নিয়ে এল।

পঞ্চানন। [চায়ে চুমুক দিয়ে] বৌদি, আপনার হাতের তৈরি চা অতি অপূর্ব। কিন্তু—

কৃতান্ত। শুধু চায়ের কথা কি বলছ পঞ্চানন! দুর্ভাগ্য—নইলে একদিন তোমায় নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দেখাতাম, কী সুন্দর ওঁর হাতের রান্না!

ভবতারিণী। থাক, খুব হয়েছে। এখন আর খোশামুদি করে গাছে তুলতে হবে না।

ভবতারিণীর কথায় পঞ্চানন হাসে।

কৃতান্ত। খোশামুদি! কি বলছ তুমি? খোশামুদি বলে কোন শব্দ কৃতান্ত বিশ্বাসের ডিক্সনারিতে নেই।

ভবতারিণী। তা জানি। তাই ভোটের সময় যে তোমায় টাকা ঢালে, তার হয়ে তুমি ঢাক পেটাতে শুরু কর। ঢাকীর বেহদ্দ—উনি আবার লোকের কাছে জাহির করে বেড়ান, আমি খবরের কাগজের

এডিটর। ও টর-টরেতে কিছু হত না—ছিল এই ভবতারিণী, তাই এ যাত্রায় তরে গেলে—

ক্রুদ্ধ ভাবে প্রস্থান।

কৃতান্ত। Nuisance! যেমন back-dated নাম, তেমনি culture! স্ত্রীর modern outlook থাকলে কী প্রেরণা, কী উৎসাহই না আজ আমি পেতাম! যদি কোন দিন বিয়ে কর পঞ্চানন, তা হলে modern—তা-ও নয়, ultra-modern দেখে বিয়ে করো।

পঞ্চানন হাসতে হাসতে চায়ের কাপ মুখে তুলল। এই সময় পটল বাবু এলেন।

পটলবাবু। নিন কৃতান্ত বাবু, আমাদের মাদুলির বিজ্ঞাপনটা—

কৃতান্তের ইঙ্গিতে পঞ্চানন বিজ্ঞাপনটা হাতে নিল।

কৃতান্ত। পটলবাবুকে একটা নিমন্ত্রণ-চিঠি দাও হে পঞ্চানন—

পটলবাবু। কিসের নেমন্তন্ন?

কৃতান্ত। ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর সরকার মহাশয়ের সম্বর্ধনা-সভা।

পঞ্চানন নাম লিখে পটলবাবুর হাতে চিঠি দিল।

পটলবাবু। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর সরকার—তাই তো! গলিটা আমাদেরই—সুপ্রসিদ্ধ লেখক কে মরতে আসবে এঁদোগলিতে? স্রেফ বাজে ভাঁওতা মশাই।

পঞ্চানন। আজ্ঞে না, সত্যিই আছেন। সাতাশ নম্বর বাড়িতে। আপনারা জানেন না?

পটলবাবু। জঙ্গল কেটে বসতি আমাদের, ইস্তক ট্যাংরার খাল নখ-দর্পণে। গলির মধ্যে লেখক এসে ঘাপটি মেরে রয়েছে, আর আমি জানিনে?

পঞ্চানন। আজ্ঞে সেইজন্যেই তো বিশেষ করে আপনাদের নেমন্তন্ন করা। হাজার হলেও আপনারা পাড়ার মাতব্বর। আপনাদের সহযোগিতা—

পটলবাবু। [মুখের কথা কেড়ে নিয়ে] সহযোগিতা ? তার জন্যে ভাববেন না। পাবেন, পাবেন, আমরা হাতে হাতে সব করে দেব। হাজার হোক পাড়ার ব্যাপার—এর আর কথা কি আছে ? তা যাক—সন্দেশটা-আশটা থাকবে তো ?

পঞ্চানন। [হেসে] আজ্ঞে হ্যাঁ, তা-ও থাকবে। সভা কাল বিকেলবেলা। বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ির উঠানে। দেখে নিন—

পটলবাবু। আমরা ঠিক যাব, দলবল নিয়ে যাব। বিজ্ঞাপনটা যাবে কিন্তু এই হপ্তা থেকে।

পঞ্চানন। ঠিক আছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের বাড়ির উঠানের অপরিসর জায়গা। বড় সতরঞ্চি পাতা। একপাশে নিচু তক্তপোষের ওপর ফরাস পেতে ভেলভেটের তাকিয়া সাজিয়ে বিশ্বেশ্বরের বসবার বেদী হয়েছে। পাশে একটি টেবিলের উপর হারমোনিয়াম। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছে। এদের মধ্যে অরুণাক্ষ, দীপক বটব্যাল ও পরিতোষ হাজরাকেও দেখা যায়। দীপক অরুণকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

দীপক। এ কি অরুণ! কি ব্যাপার বল তো ? ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তুমিও খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে নাকি ? বলি, চাঁদা খসল কত ?

অরুণ। এক পয়সাও না। কৈ, আমার কাছে তো কেউ চাঁদা চায়নি! একটা নেমন্তন্ন-চিঠি পেলাম, তাই ভাবলাম, দেখে আসি ব্যাপারটা কি ?

দীপক। ব্যাপার ভাল।

কৃতান্ত এসে বলে—

কৃতান্ত। একি, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।

অরুণ। ঠিক আছে, আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

প্রকাশ ও পঞ্চাননকেও দেখা যায়। গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে পটলবাবু আসেন। পঞ্চানন তাকে অভ্যর্থনা করে বলে—

পঞ্চানন। এই যে আসুন, আসুন। পটলবাবু—

পটলবাবু। ঠিক সময় এসেছি তো?

পঞ্চানন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পটলবাবু। বলুন, কি করতে হবে?

পঞ্চানন। উপস্থিত কিছু দরকার নেই। দরকার হলে বলব। বসুন।

পটলবাবু বসলেন। ইরা বিশ্বেশ্বরের হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। কৃতান্ত বলে—

কৃতান্ত। ইরা মা, দাদাকে একেবারে বেদীতে বসিয়ে দাও।

ইরা বেদীর উপর বিশ্বেশ্বরকে বসাল। একটি মেয়ে গিয়ে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। একটি মেয়ে মাল্যদান করে। কৃতান্ত বলে—

কৃতান্ত। পঞ্চানন, গান দিয়ে এবার তাহলে সভার কাজ শুরু করা হোক।

পঞ্চানন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করে লাভ নেই।

কৃতান্ত। তাহলে উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ কর মাধুরী—

[মাধুরীর গান]

অতীতের তীর হ'তে স্মরণের বাঁশরীরে
বাজাও কী-সুরে তুমি কালের রাখাল
জীবনের সাগর-তীরে।
সেদিনের কিছু কথা কিছু গান
কিছু ব্যথা কিছু খুশিভরা প্রাণ
কী সুরভি কেঁপেছিল বকুলের হিয়া-নীড়ে
সেই সুরে ধর বাঁশী কালের রাখাল
জীবনের সাগর তীরে।

সে দিনের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি
ভরিয়া তুলুক তব গীতি
ভালবেসে সুখদীপ কে জ্বালাল
আশা ভরা সে প্রদীপ কে নেভাল
কার হাসি নিবে গেল কার দুটি আঁখি নীরে—
সেই সুরে ধর বাঁশী কালের রাখাল
জীবনের সাগর-তীরে ॥

গানের পর সকলে হাততালি দেয়। কৃতান্ত সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু ভূমিকা করে—

কৃতান্ত। আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সরকার মশাইকে শ্রদ্ধা জানাতে। এটা আমদের নিতান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তাই কাউকে আমরা সভাপতি-পদে মনোনীত করিনি। শ্রদ্ধেয় বিশ্বেশ্বর-দাকে ঐ বেদীতে বসিয়ে আমরা সকলে নিচে বসব।

দীপক। সাধু, সাধু!

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ ফুলের তোড়া দিল বিশ্বেশ্বরকে; কেউ লাল টকটকে গোলাপের মালা দিল বিশ্বেশ্বরের গলায়। আনন্দের আতিশয্যে বিশ্বেশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে মালা তোড়া নিতে থাকেন। ইরার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে চলে যায়। ফুল দেওয়ার পর্ব শেষ হলে কৃতান্ত সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো অভিনন্দনপত্র হাতে নিয়ে বলে—

কৃতান্ত। এবার সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দনটি পাঠ করবেন আমার সুযোগ্য সহকারী শ্রীপঞ্চানন সরখেল।

পঞ্চানন। [গলা ঝেড়ে] জ্ঞান-তপস্বী, ঐতিহাসিকপ্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সরকার সম্মানীয়েষু—
হে তপোবনের ঋষি!

তোমার সাধনার বলে আমরা কি ও কে তা বিশদভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। সত্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে তুমি তোমার জীবনের সমস্ত সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়েছ। তুমি সকলের নমস্য।
হে তথ্যানুসন্ধানী!

'ভারতে ইংরাজ' রচনা করে তুমি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ। তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে এই নাগরিক সম্বর্ধনা-সভায় তোমাকে আমরা সম্বর্ধিত করছি। তুমি আমাদের অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—

পশ্চিমবঙ্গের গুণমুগ্ধ অধিবাসিবৃন্দ

অভিনন্দন পড়া শেষ হলে বাঁধানো লেখাটা পঞ্চানন বিশ্বেশ্বরের হাতে তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি। ইরা ফিরে এসে আবার তার বাবার পাশে বসেছে। বিশ্বেশ্বর তাকে বলেন—

বিশ্বেশ্বর। কোথায় ছিলি মা এতক্ষণ? পঞ্চানন অভিনন্দনটা বড় ভাল লিখেছে। শুনতে পেলি নে। কত ভাল ভাল কথা! তোর মা শুনেছে? সে যে কিছু বিশ্বাস করে না।

বিশ্বেশ্বরের কথায় অনেকে মুখ টেপাটেপি করে হাসে। ইরার তা চোখ এড়ায় না। ইরা ডাকে—

ইরা। বাবা!

বিশ্বেশ্বর। উঃ, কত ফুল দিয়েছে দেখ্। লাল গোলাপগুলো বড্ড ভাল। দেখ্, গন্ধটা কি রকম শুঁকে দেখ্—

কৃতান্ত। এইবার শ্রদ্ধেয় বিশ্বেশ্বর-দা দু-চার কথা বলবেন।

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, বলব বই কি! তোমরা সকলে বয়োকনিষ্ঠ— 'তুমি' বলেই বলছি। আমার 'ভারতে ইংরাজ' নিশ্চয় সকলে পড়েছ—

'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' করে সকলে ঘাড় নাড়ে। অরুণাক্ষ সব চেয়ে বেশি জোরে সায় দেয়।

বিশ্বেশ্বর। রামনিধি সরকার কে জান? জান না? তিনি ছিলেন মস্তবড় উকিল। আমার পিতামহ। কুসুমপুরের কুঠিয়াল টমাস সাহেবকে পুড়িয়ে মারার অপরাধে রামনিধির ফাঁসি হয়। এখন সেই ঘটনাটা তোমাদের বলি। রামনিধির ছেলের অন্নপ্রাশন, কিন্তু পুরুত আসেন না। শেষে শোনা গেল, টমাস সাহেব পুরুতকে জোর করে পথ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নীলকুঠির উঠান ঝাঁট দিয়ে নিয়েছে। রামনিধি শুনে তো ক্ষেপে গেলেন। রামনিধি টমাস সাহেবকেও ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করেছিলেন! টমাস সাহেব এলে রামনিধি সাহেবের হাতে ঝাঁটা তুলে দিয়ে নিজের উঠান ঝেঁটিয়ে নিয়ে পুরুতের অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। নীলকুঠির সাহেবদের ওপর দেশের লোক এমনিই চটে ছিল। এই ঘটনার পর তাদের সাহস বেড়ে গেল। একদিন রাত্রে তারা কুঠিতে আগুন দিয়ে সাহেবকে পুড়িয়ে মারল। অন্নপ্রাশনের দিন থেকে এটা চোদ্দদিন পরের ঘটনা। কিন্তু রেকর্ডে অন্নপ্রাশনের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর। অর্থাৎ বাংলা পৌষমাস। ভুল রেকর্ড। আচ্ছা, তোমরাই বল, পৌষমাসে কখনও শুভকর্ম হয়? (বই দেখিয়ে) "ভারতে ইংরাজ" বইয়ের আট পাতা জুড়ে আমি এই ব্যাপার নিয়ে লিখেছি।

অরুণ। আজ্ঞে হাঁ দেখেছি, আপনার বই-এ। শুধু দেখা কেন? ওর লাইনকে লাইন মুখস্থ।···কিন্তু আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। ততক্ষণ বরং একটা গান হোক।

বিশ্বেশ্বর। কষ্ট? কিছু না, কিছু না—

দীপক। হচ্ছে কষ্ট। আপনি টের পাচ্ছেন না। গানই হবে।

কৃতান্ত। বেশ। তাই হোক। আমাদের লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান লিখেছেন, সেটি গেয়ে শোনাবেন।

অরুণ। বেশ, বেশ—

[কৃষ্ণার গান]

সূর্য বাঁধে তোমার হাতে অরুণ-রাখী ;
ধ্রুবতারার স্বপ্ন জ্বালে তোমার আঁখি ॥
লুকিয়ে আছে কোন্ জীবনের কী কথা,
কে বোঝেনি কার হৃদয়ে কী ব্যথা,
জাগাও তারে গান ভুলেছে যে পাখী ॥
পাষাণ-কারায় লুকিয়ে কাঁদে কোন্ নির্ঝর ?
শিকল-শিলায় বন্দী হয়ে রয় নিথর।
কোন্ মধু যে ফুরিয়ে গেল কোন্ ফুলে,
কে হারাল কোন্ অতীতে কার ভুলে—
দাও ধরিয়ে— পড়ুক ধরা সেই ফাঁকি ॥

ইরা বাপের হাত ধরে টেনে বলে—

ইরা। চলো বাবা, ঘরে চলো। সভা হয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বর। হয়ে গেল কি রে ? আমি জিরিয়ে নিয়েছি। আবার বলব—

ইরা। না, বলবে না। কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরকে উঠতে হয়। ইরা বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে যাবার সময় কৃতান্তকে বলে—

আপনি একটু আসুন কাকাবাবু, খাবার দিতে হবে। [অন্য মেয়েদের প্রতি] তোমরাও এসো ভাই।

মেয়েরা ইরাকে অনুসরণ করে।

কৃতান্ত। প্রকাশকে নিয়ে তুমিও এসো পঞ্চানন, হাতে হাতে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাক।

পঞ্চানন। চলুন—

কৃতান্ত, প্রকাশ ও পঞ্চানন চলে গেল।

অরুণ। [নিশ্বাস ছেড়ে] বাব্বাঃ!

দীপক। রবিবারের বিকেলটা মাটি—

পটলবাবু। (ইতিপূর্বে বিড়ি ধরিয়েছিল, জোরে দু-টান দিয়ে) বিশ্বেশ্বর বাবু বলেন একটু বেশি, কিন্তু সাচ্চা লেখক—হেলাফেলার বস্তু নন।

দীপক। উনি মোটেই লেখক নন। আমার কাকার সঙ্গে কালেক্টরেটে রেকর্ড-কীপারের কাজ করতেন। লেখক ছিলেন তখন, লিখতে লিখতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। ঐতিহাসিক হবার পর তো কলম ছেড়েছেন।

পটলবাবু। কলম ছেড়েছেন? (বেদীর উপর 'ভারতে-ইংরাজ' বই ছিল, সেটা দেখিয়ে) তাহলে ঐ অমন ঢাউস বইটা কি মন্তরে বেরিয়ে গেল মশাই?

দীপক। ও সব বই লিখতে কলম লাগে না। গঁদের আঠা আর কাঁচি—এ দুটো হলেই চলে যায়। যেখানকার যত পুরোন পচা লেখা এক জায়গায় এনে আঁটা।

কথার মাঝে ইরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে ছুটে ভিতরে চলে যায়। অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জল ভর্তি ডেকচি পড়ার আওয়াজ। ভেতর থেকে পঞ্চানন ও কৃতান্তের গলা—

কৃতান্ত। কি হল, কি হল?

পঞ্চানন। অ্যাঁ, ডেকচি সুদ্ধ জল লুচির চ্যাঙারিতে। সমস্ত বরবাদ!

কৃতান্ত। এত কষ্ট করে এত সমস্ত তৈরি করলে। জল পড়ে গেল ইরা?

বেগতিক বুঝে সভার অনেকে চলে যাচ্ছে। তাদের দু'চারজনের মধ্যে কথাবার্তা।—

পরিতোষ। দীপক চলো হে! ব্যাপার বড় সুবিধের নয়।

দীপক। বক্তৃতা-টক্তৃতা শুনিয়ে দিয়ে আসল সময়ে লুচিতে জল?

পটলবাবু। তাহলে কি হবে?

পরিতোষ। হবে আর কি, কচু হবে। ভেজিটেবল-ঘিয়ের দু-খানা লুচি মুখে দিয়ে কি চতুর্বর্গ ফল লাভ হত শুনি? চলো হে! আকাশের গতিক সুবিধের নয়। কি হে অরুণ, থাকবে না যাবে?

অরুণ। থাকব।

অরুণ গোপীনাথ আর পটলবাবু ছাড়া সকলে চলে গেল। পটলবাবু যাবেন কিনা ভাবছেন। অরুণকে বলে—

পটলবাবু। আপনি গেলেন না?

অরুণ। না। আমি বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাব।

গোপীনাথ। ও! খাওয়াদাওয়ার তাহলে আর চান্স নেই, কি বলেন?

অরুণ। মোটেই না।

পটলবাবু। তবে আর কি হবে!

দুঃখিতভাবে পটল চলে যান। অরুণ অপেক্ষা করে। পঞ্চানন বেরিয়ে এসে বলে—

পঞ্চানন। এই যে অরুণবাবু—

অরুণ। আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। (পকেট থেকে কেস সমেত একটা কলম বের করে) জন্মদিন উপলক্ষে এটা ওঁকে দিয়ে যাব।

পঞ্চানন। কলম? বেশ তো! (দরজার কড়া নেড়ে ডাকছে)

ইরা, ইরা! (অরুণকে) জানেন, ইরার হাত ফসকে এক হাঁড়ি গরম জল পড়ে গিয়ে লুচিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল।

অরুণ। উনি পোড়েন নি তো?

পঞ্চানন। না। কী আর করা যাবে! accident is accident—ইচ্ছে করে ফেলেনি তো!

পঞ্চাননের কথার মাঝে ইরা প্রবেশ করে বলে—

ইরা। ইচ্ছে করে ফেললেও অন্যায় হত না পঞ্চাননদা। ভুল করেছি। বোকামি করেছি বাবার সম্বর্ধনার আয়োজন করে।

পঞ্চানন। সে কি! ও-কথা কি বলতে আছে? যাক। আজকের এই জন্মদিন উপলক্ষে এই কলমটা অরুণবাবু তোমার বাবাকে দিয়ে যেতে চান—

অরুণের হাতে কলম দেখে ইরা জ্বলে যায়। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কৌতুকের স্বরে বলে—

ইরা। কলম? কলম কি হবে? কাঁচি দিলে বরঞ্চ কাজে আসত—

পঞ্চানন কথাটা ধরতে পারে না।

পঞ্চানন। সে আবার কি কথা?

ইরা। হ্যাঁ, তাই তো বলছিলেন ওঁরা। আমার বাবার কাজ তো কলমের নয়—কাঁচি আর আঠার।

অরুণ। কিন্তু আমি তো কিছু—মানে, কেউ কেউ বলছিল বটে।

পঞ্চানন। বললেই হল! পুরোন দলিল ঘেঁটে ঘেঁটে মালমসলা উদ্ধার করা—'ভারতে-ইংরাজ' পড়ে দেখলে কদরটা বুঝত।

ইরা। উনি ইতিহাসের ছাত্র। অন্যে পড়ুক আর না পড়ুক, উনি কিন্তু ভয়ানক রকম পড়েছেন।

অরুণ। পড়েছি বৈ কি!

ইরা। শুধু পড়া? মুখস্থও বলে যেতে পারেন গড়গড় করে। [হেসে] ভয় নেই, মুখস্থ আমি ধরতে যাব না।

পঞ্চানন। উপহারের জিনিসটা অরুণবাবু তোমার বাবার হাতে দিতে চান।

ইরা। উপহারের নয়, উপহাসের জিনিস। অদৃষ্টে যা দুর্ভোগ ছিল, হয়ে গেল। ও জিনিস বাবাকে আমি কক্ষণো ছুঁতে দেব না।

পঞ্চানন। সে কি কথা! ভালবেসে শ্রদ্ধা করে নিয়ে এসেছেন—

ইরা। [ব্যঙ্গের স্বরে] শ্রদ্ধা, ভালবাসা! সরল আপন-ভোলা মানুষটিকে নানান কথায় ক্ষেপিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সব মজা দেখেন। বইটা চোখেও দেখেন নি, অথচ লাইন ধরে ধরে নাকি মুখস্থ!

অরুণ। [প্রতিবাদের স্বরে] চোখে দেখিনি? কে বলে এমন কথা? আছে মুখস্থ। ধরবেন আপনি পাতায় পাতায়। আমি পরীক্ষা দিতে আসব।

ইরা। আসতে হবে না। আমি জানি, আমি জানি। [দু-চোখ বেয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ল] আমার বাবা কারো সাতে নেই, পাঁচে নেই। পাগলামি করুন আর যাই করুন—নিজের ঘরে বা লাইব্রেরিতে বসেই তা করেন। কাউকে উপযাচক হয়ে কিছু বলতে যান না। বুড়োমানুষ বলে দয়া নেই। দল বেঁধে বাড়ি বয়ে তাঁকে অপমান করতে আসা! আপনারা শিক্ষিত মানুষ—বাবার জন্মদিনের ব্যাপারে আজকের এই একটা দিন অন্তত রসিকতাগুলো না করলেও পারতেন। আরও তো তিনশ চৌষট্টি দিন পড়ে রইল! এই বাড়িটা বাদ দিয়ে আরও তো কতশত বাড়িতে পার্কে পথে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা চলতে পারত!

ইরার কথার মাঝে বিশ্বেশ্বর ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বেশ্বর। কি হয়েছে? কি হয়েছে ইরা?

ইরা। (ব্যাকুলভাবে) কিছু হয়নি বাবা! তুমি এসো না। তুমি চলে যাও—তুমি চলে যাও—

ইরা কাঁদতে কাঁদতে বিশ্বেশ্বরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পঞ্চানন আর অরুণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীপুর। প্রতুল দত্তের বাড়ির হলঘর। ঘরটি সুসজ্জিত। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতাদের ছবি চারিদিকে টাঙানো। এই হলঘরের মাঝ দিয়ে দোতলার ঘরে যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। যবনিকা উঠলে দেখা গেল, সুনন্দা নাচছে; সুনন্দার মামাতো বোনেরা ও বান্ধবীরা নাচ উপভোগ করছে। বেশ জমে উঠেছে, সেই সময়ে অরুণ এলো। তার হাতে এক কপি 'ভারতে ইংরাজ'। নাচ শেষ হল।

শোভা। এত দেরি করলেন? একেবারে ঘরোয়া function—মানে, এই সুনন্দার নাচ। সে নিজে গিয়েছিল আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে।

অরুণ। সত্যি, আমি দুঃখিত। এই বই খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল। খুব দরকারি বই। কিন্তু কোন দোকানে রাখে না। শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা অবধি ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্টে একখানা পেলাম।

সুনন্দা বইটা হাতে নিল।

সুনন্দা। দেখি। বাপরে বাপ! এ যে অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। 'ভারতে ইংরাজ'—এ বই কি হবে?

অরুণ। এগজামিন—

সুনন্দা। এগজামিন? কিন্তু এম. এ. তে তো এ বই পড়া হয় বলে মনে হচ্ছে না।

অরুণ। এম. এ. ছাড়া আর পরীক্ষা নেই নাকি? এম. এ. তো

তুড়ি মেরে পাশ করে যাব। এ ভারি কড়া পরীক্ষা। মুখস্থও ধরতে পারে।

সুনন্দা। সত্যি, কী নিষ্ঠা আপনার! এম. এ. রয়েছে—তার ওপর বাইরের সব এগজামিন দিচ্ছেন।

আভা। সত্যি—

সুনন্দার মা সাবিত্রী দেবী প্রবেশ করলেন।

সাবিত্রী। বেবী, তোমার দিদিমণি এসেছেন। পড়ার ঘরে বসে আছেন।

বেবী। যাই।

বেবী চলে গেল।

সাবিত্রী। এই যে অরুণ, কতক্ষণ বাবা?

অরুণ। এই কিছুক্ষণ।

সাবিত্রী। কর্তার অসুখ। তোমার বাপের ওপর ওঁর ভারি বিশ্বাস। ছেলেবেলার বন্ধু। বলেন, অম্বুজ একেবারে ধন্বন্তরী। তাঁর ভরসায় কানপুর থেকে এসে রইলাম, অথচ তাঁকে পাচ্ছি না।

অরুণ। আমার চিঠি পেয়ে বাবা-মা কাল রাত্রে দেশ থেকে ফিরেছেন। আসবেন এখানে।

সাবিত্রী। ফিরেছেন? যাক—নিশ্চিন্ত হলাম। রোগা মানুষের মুখে দিনরাত্তির ওঁর নাম। যাই, খবরটা দিই গে। তোমার বাবা এসেছেন—শুনলে নিশ্চিন্ত হবেন।

সাবিত্রী দেবী সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।

সুনন্দা। আপনার বাবা-মা প্রায়ই বুঝি দেশের বাড়ি যাতায়াত করেন?

অরুণ। হ্যাঁ। বাবা এবার মণিরামপুর থেকে এ্যাসেমব্লিতে দাঁড়াচ্ছেন।

সুনন্দা। ও!

অরুণ। শুনলাম, নমিনেশন দেওয়া নিয়ে মধ্যে একটা মীটিং হয়ে গেছে এখানে?

শোভা। হ্যাঁ। ভয় নেই। আপনার বাবা নমিনেশন পাবেনই। হাজার হোক, তিনি আবার বাবার বেয়াই হতে চলেছেন।

শোভার কথায় লজ্জা পেয়ে সুনন্দা চলে যাচ্ছে।

শোভা। এই, চললি কোথা সুনন্দা?

সুনন্দা। আহা! কোথা আবার যাব, আসছি এখুনি। আয় আভা—

সুনন্দা ও আভা চলে গেল। প্রতুল দত্ত উপর থেকে নেমে এলেন। অরুণ উঠে নমস্কার করে।

প্রতুল। এই যে অরুণ! তোমার বাবা ফোন করলেন, এক্ষুণি আসছি। সে তো প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল।

অরুণ। এতদিন পরে ফিরেছেন, রুগিরা ছেঁকে ধরেছে। তাই বোধ হয়—

এই সময়ে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

আমাদের গাড়ির হর্ন মনে হচ্ছে। বাবা এলেন বোধ হয়।

প্রতুল। ও! আচ্ছা আমি দেখছি।

প্রতুল দত্ত বাইরে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছেন।

প্রতুল। আসুন, আসুন ডাক্তার রায়।

প্রতুল দত্ত ও অম্বুজাক্ষ ঘরে ঢুকলেন।

অম্বুজ। [অরুণের প্রতি] তুই কতক্ষণ?

অরুণ। এই একটু আগে এসেছি। এঁরা খবর দিয়ে এসেছিলেন—

অম্বুজ। ও! (প্রতুল দত্তের প্রতি) আমার বন্ধু—মানে, আপনার ভগ্নিপতি কেমন আছেন প্রতুল বাবু?

প্রতুল। দেখুন ডাঃ রায়, লোকের মতিগতি এখন অন্যরকম। কমিটিতে আমি একা নই, আমার একার কথায় কিছু হবে না।

অম্বুজ। বেশ !···অরুণ !··· ওঃ, চলে গেছে। [চলে যাচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন] শুনুন প্রতুলবাবু, আপনার ভগ্নিপতি আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যবন্ধুর মুখের ওপর কথাটা বলতে সঙ্কোচ হল। আপনি অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেবেন, সুনন্দার সঙ্গে বিয়ে বোধহয় ঘটে উঠবে না। ছেলের মায়ের আপত্তি। আমাদেরও একটা কমিটি আছে—আমার স্ত্রী, আমার ছেলে আর আমি। সুতরাং আমারও একার কথায় কিছু হবে না।

অম্বুজ ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায়ের বাড়ি। অরুণের পড়ার ঘর। অরুণ 'ভারতে-ইংরাজ' পড়ছে। ক্লান্ত। এক গ্লাস জল খেল। পাখার রেগুলেটার বাড়িয়ে দিল। হরিহর প্রবেশ করে বলে—

হরিহর। তোমার হল কি দাদাবাবু? সকাল থেকে এক নাগাড় পড়ছ। বাইরে একবার বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এসো। ঘরটা ততক্ষণ ঝেড়েপুছে দিই।

অরুণ। না রে, না। কিছু করতে হবে না। তুই যা, আমি আজ মরিয়া। (হরিহর চলে গেল) ভাষা কি কটোমটো রে বাবা! দাঁত ভেঙে যায়।··· ··শেষ না করে আজকে আর আমি উঠব না।

অরুণ পুনরায় পড়তে থাকে। সুহাসিনী এলেন।

সুহাসিনী। তোর কি হয়েছে, খুলে বল্ তো অরুণ।

অরুণ। কি আবার হবে মা? বললাম তো—পরীক্ষা।

সুহাসিনী। পরীক্ষা তো আরও কতবার দিয়েছিস। বুঝতে পেরেছি, রাগ হয়েছে কি জন্যে।

পড়তে পড়তে অরুণাক্ষর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উল্লাসে সে চেঁচিয়ে উঠল—

অরুণ। না না, রাগটাগ নয়। কাশীশ্বরের কথা পেয়েছি। ভারি intersting—তাই দিনরাত পড়ে চলেছি।

সুহাসিনী। কাশীশ্বর—কোন্ কাশীশ্বর?

অরুণ। আমাদের পূর্বপুরুষ। জান মা, আমবা সবচেয়ে বড় কুলীন।

সুহাসিনী। কুলীন? তোরা আবার কুলীন কিসে? তোরা মৌলিক। কায়েতের মধ্যে ঘোষ-বোস-মিত্তির এরা হল কুলীন। সে বটে আমার বাপের বাড়ি।

অরুণ। তোমার বাপের চেয়ে অনেক বড় কুলীন আমরা। আহা, বল্লালি-কুলের কথা কে বলছে! দেশের মুক্তি-সাধনায় যাঁরা আত্মদান করেছিলেন, স্বাধীন-ভারতে তাঁরাই বংশ ধরে আজ বড় কুলীন।

সুহাসিনী। কিন্তু কাশীশ্বর?

অরুণ। ইংরেজের খয়ের-খাঁ বলে কাশীশ্বব সম্বন্ধে মিথ্যে রটনা চলে এসেছে এতদিন। তিনি নিজের বিপদ জেনেও রামনিধিকে কলকাতার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যার ফলে ইংরেজের হাতেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

সুহাসিনী। বলিস কি?

অরুণ। হ্যাঁ।

অম্বুজাক্ষ প্রবেশ করলেন। সাহেবি পোশাকের সঙ্গে গলায় ষ্টেথিসকোপ ঝুলছে। অরুণ বইটা বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—

অরুণ। বাবা, এই বইটা একটু পড়ে দেখুন—

অম্বুজ। [বইটির দিকে চেয়ে], কি—ইতিহাস? তোর এগজামিনে লাগবে—তুই পড়বি। আমি কোন্ দুঃখে ইতিহাস পড়তে যাব?

অরুণ। কাশীশ্বরের কথা আছে বাবা—

অম্বুজ। কাশীশ্বর, কাশীশ্বর! শুনে শুনে আর পারিনে। বংশ-ধরে অভিশাপ লেগেছে তাঁর কাজকর্মে—

অরুণ। না বাবা, থিওরি উল্টে গেছে। পরম দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি। এই জায়গাটা—চাঁদপালঘাটে তাঁকে মেরে ফেলেছে—সেইটা একবার পড়ুন। [অরুণ বইটা অম্বুজের হাতে তুলে দেয়। অম্বুজ জায়গাটা পড়তে থাকেন। অরুণ বলছে—] মৃতদেহ পড়ে আছে কাশীশ্বরের। ভাল মানুষ, পাল্কি-বেহারা লোক-লস্কর নিয়ে নিমন্ত্রণে গেছেন—কে তাঁকে মারল, দেহটা কি ভাবে এখানে এসে পড়ল, তারই বিস্তারিত আলোচনা। আলোচনা করছেন ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর।

অরুণ বলে যাচ্ছে, আর অম্বুজাক্ষ একমনে জায়গাটা পড়ছেন। তারপর বললেন—

অম্বুজ। হুঁ! বইটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও। আর দেখ, এই বই আরও খান পঞ্চাশেক কালকে কিনে এনো।

অরুণ। দাম যে ভয়ানক বাবা। পঞ্চাশখানায় চার-শ' টাকা পড়বে।

অম্বুজ। পড়ুক। টাকার ভাবনা তোমার নয়।

সুহাসিনী। ও বই কিনে কি হবে শুনি?

অম্বুজ। কাজে লাগবে। ইলেকসনে আর ডরাই নে। শনিবারে আবার মণিরামপুরে যাচ্ছি। ও-তল্লাটে যত লাইব্রেরি আছে, একটা করে এই বই দিয়ে দেব। লোকের মুখে মুখে যাতে কাশীশ্বরের কথা প্রচার হয়, তার ব্যবস্থা করব। কাশীশ্বরকে লোকে

ভুল বুঝে আছে। সত্যি কথা জানুক। প্রতুল দত্ত বড্ড খেলাচ্ছে—নমিনেশনের আর পরোয়া করি নে। সাধন মিত্তির আমার বিপক্ষে দাঁড়াবে শুনছি।

অরুণ। হ্যাঁ বাবা, আমিও শুনেছি।

অম্বুজ। দাঁড়াক। এই বই কাল পঞ্চাশখানা আনা চাই।

প্রস্থানোদ্যত

ভাল কথা—লেখক বিশ্বেশ্বর কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা বের করতে পার?

অরুণ কিছুক্ষণ চিন্তার ভাণ করে।

অরুণ। তা বোধহয় পারা যায়। সম্বর্ধনা-সভা হয়েছিল, সেই সময়ে কাগজে যেন ঠিকানা দেখেছিলাম। খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে।

অম্বুজ। হয়তো নয়, পেতেই হবে। ইয়ংম্যান—জোর করে বলতে পার না, বের করবই খুঁজে? আশ্চর্য!

অরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। করব।

অম্বুজ। তাঁকে চাই। তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক-মোচন করেছেন। তাঁকে মণিরামপুর নিয়ে যাব। সে জন্যে যা-কিছু দরকার, করতে হবে। বিশ্বেশ্বর বাবুকে নিয়ে বিরাট সভা করব। বক্তৃতায় উনি বুঝিয়ে দেবেন, ও অঞ্চলে আত্মত্যাগী বীর যেমন রামনিধি, তেমনি কাশীশ্বর। তুমি দেখ, যে কোন উপায়ে বিশ্বেশ্বর বাবুকে নিয়ে যেতে হবে।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের বাড়ির বাইরের ঘর। ঘরের মধ্যে খান দুই টিনের চেয়ার। একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর মাদুর বিছানো। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার। মঞ্চ ঘুরে এলে দেখা গেল, সরমা কড়া নাড়ার আওয়াজে খিল খুলে দিচ্ছেন। একটুখানি দরজা ফাঁক করে আড়াল থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন—

সরমা। কোত্থেকে আসছেন আপনি? কি দরকার?

অরুণ ঘরে প্রবেশ করে। সরমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে—

অরুণ। আমি আপনার ছেলের মতো। 'আপনি' বলছেন কেন?

সরমা। [লজ্জিত ভাবে] না না, ভুল হয়ে গেছে। আর 'আপনি' বলব না। বস বাবা, বস।

অরুণ তক্তপোষে বসল।

অরুণ। আমি মা ইতিহাসের ছাত্র। অতবড় ঐতিহাসিকের পায়ের নিচে একটুখানি বসে যাব বলে এসেছি।

সরমা। আচ্ছা, তুমি বস। আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।

সরমা চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে চটির আওয়াজ তুলে বিশ্বেশ্বর ঘরে প্রবেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর। আপনি?

অরুণ। আমি আপনার ভক্ত। সেই সভার দিন আপনার ঠিক সামনেই বসেছিলাম। দেখেন নি?

বিশ্বেশ্বর। [আমতা আমতা করে] হাঁ হাঁ, দেখেছি বই কি! সামনে বসেছিলে যখন, তখন ঠিকই দেখেছি। তুমি কে বাবা?

ইরা প্রবেশ করে। সে বলে—

ইরা। বাবা, এঁরা মস্ত বড়লোক। গাড়িখানা দেখে এসো একবার। বড় রাস্তায় গলির সমস্তটা মুখ জুড়ে রয়েছে, আর লোকজন যাতায়াত করছে ভাঙা নর্দমার ওপর দিয়ে নোংরা জলকাদা মেখে।

অরুণ। [ব্যস্ত ভাবে] ছি ছি, কী অন্যায়! ড্রাইভার সরিয়ে রাখে নি গাড়িটা? আচ্ছা, আমি এক্ষুণি বের করে দিয়ে আসছি।

অরুণ উঠে দাঁড়াল। ইরা বাধা দিয়ে বলে—

ইরা। থাক, থাক। আপনাকে আর যেতে হবে না। ড্রাইভার নিজেই সরিয়ে দিয়েছে। বড়লোকের ড্রাইভার—প্রথমটা সকলকে তুড়ে দিচ্ছিল। তা আমি হলাম ডাকসাঁইটে ঝগড়াটে, পেরে উঠবে কেন আমার সঙ্গে?

অরুণ। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এর পরে আবার যখন আসব, তখন আর গাড়ি আনব না—পায়ে হেঁটেই আসব। আমি ইতিহাসের ছাত্র। এ বাড়ি এ ঘর আমার তীর্থভূমি। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে তীর্থ করতে হয়। নইলে তীর্থের ফল পুরোপুরি ফলে না।

বিশ্বেশ্বর। [সানন্দে]—আহা হা! কী কথাই বললে বাবা! তুমি কে বাবা?

ইরা। এঁর বাবা মস্তবড় ডাক্তার—অম্বুজাক্ষ রায়। শহর-জোড়া নাম।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ! হ্যাঁ, নাম শুনেছি বোধ হয়—

ইরা। [হেসে] কিছু শোন নি বাবা। একালের কিছুই তুমি কানে নাও না। তোমার চেনাজানা সেকালের যত ইতিহাসের মানুষ—

অরুণ। বেশ, তাই যদি হয়—হালফিলের কথা না বলে, সেকালের সেই ইতিহাসের পরিচয়ই তবে হোক।…দেখুন, আমার প্রপিতামহ হলেন কাশীশ্বর রায়।

বিশ্বেশ্বর। কোন কাশীশ্বর?

অরুণ। কাশীশ্বর রায়—যাঁর মাথা ফাটিয়ে নীলকরের চেলা-চামুণ্ডারা গঙ্গার ঘাটে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

বিশ্বেশ্বর। বটে! বটে! তা হলে তুমি আমাদের খুবই আপনার হে! একই গ্রামের লোক আমরা। আর রামনিধি হলেন আমারই পিতামহ।

অরুণ। তাই নাকি?

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ। ওরে ইরা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, একটু চা-টা করে এনে দে।

ইরা প্রস্থানোদ্যত। অরুণ বাধা দিয়ে বলে—

অরুণ। না না, চায়ের দরকার নেই।

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চয়ই আছে। ও কি কথা!

ইরা চলে যায়। বিশ্বেশ্বর বলেন—

সরকারি চাকরি করবার সময় রেকর্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একদিন রামনিধির পরিচয় পাই। আর, তারপর থেকেই ইতিহাসের অনুসন্ধান করে চলেছি—

অরুণ। আপনার অনুসন্ধান সার্থক হয়েছে। বাবা আপনার বই পড়ে ভারি খুশি হয়েছেন। বলে দিয়েছেন, দয়া করে একটিবার আপনাকে মণিরামপুর যেতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। আমি? না না, আমি তো কোথাও যাই নে। বুড়ো হয়েছি, ক'দিন আর বাঁচব! তার মধ্যে অনেক কাজ বাবা, কাজের আর অন্ত নেই।

অরুণ। কাশীশ্বরের ছবি রয়েছে আমাদের মণিরামপুরের বাড়িতে। আরো একখানা ছবি আছে—হয়তো রামনিধিরই। গিয়ে দেখলে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

বিশ্বেশ্বর। ছবির আর দেখবার কি আছে? দুটো হাত, দুটো

পা, একটা মাথা। সে তো সব মানুষেরই থাকে। বলি, কাগজপত্র কিছু আছে কি ? পুরোন চিঠিচাপাটি ?

অরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বৈ কি ! তিনটে কাঠের সিন্দুক বোঝাই পুরোন পুঁথি আর কাগজপত্তোর।

বিশ্বেশ্বর। ওগো, শুনছ ? [বিশ্বেশ্বরের ডাকে সরমা প্রবেশ করেন]

সরমা। কি ?

বিশ্বেশ্বর। ছেলেটি কে জান ? আমাদের বড্ড আপনার লোক গো ! আমাদের বড্ড আপনার !

সরমা। তা জানি—

বিশ্বেশ্বর। আমাদের মণিরামপুরেই এদের বাড়ি। কাশীশ্বরের বংশধর।

সরমা। কাশীশ্বর-টাশিশ্বর বুঝি নে। অতদুর হাতড়াতে যাব কেন ? মা বলে ডেকেছে, ও আমার ছেলে। যে দু'টি চলে গিয়েছিল—ও তাদেরই একটি। কি নাম তোমার বাবা ?

অরুণ। আজ্ঞে, অরুণাক্ষ রায়। এত আপনার যখন করে নিলেন, তখন আর কিছুতেই ছাড়ছি নে। আপনার কোন ওজর-আপত্তি শুনবো না। যেতেই হবে আপনাকে। বাবা সেই তিন সিন্দুক বোঝাই পুরোন কাগজপত্তর আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

বিশ্বেশ্বর। তোমার বাবা আমার হাতে সব তুলে দিতে চান ?

অরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কোনটা দরকারি, কোনটা বেদরকারি আপনি নিজে বেছেগুছে নিয়ে আসবেন।

বিশ্বেশ্বর। [এক গাল হেসে] ঠিক বলেছ বাবা, ঠিক বলেছ। আমি যাব। তা কবে যেতে বলছ আমায় ?

অরুণ। আজ্ঞে, বাবা মাকে নিয়ে কাল সকালবেলা চলে যাচ্ছেন। বাবার ইচ্ছে চারটে দিন বাদে, ধরুন শনিবারের দিন। মণিরামপুরে আপনাকে নিয়ে সভা হবে। এখানকার চেয়ে অনেক বড় সভা।

বিশ্বেশ্বর। সভা-টভা আর কেন? তবে শনিবারেই যাব। তিন তিনটে সিন্দুক বোঝাই কাশীশ্বরের আমলের কাগজপত্তোর আছে, বলছ যখন—

অরুণ। তা হলে বাবাকে গিয়ে ঐ কথাই বলব। আপনার কোন রকম অসুবিধে হবে না। নদীর এপার পর্যন্ত দশ মাইল পথ এখন পাকা-রাস্তা হয়ে গেছে—মোটরবাস চলে। নদীটা পেরিয়ে ওপারে আমাদের পাল্কি থাকবে।

বিশ্বেশ্বর। [চিন্তিত ভাবে] বড্ড হাঙ্গামার পথ। হাড়পাঁজরা-গুলো পথে খুলে খুলে না পড়ে! আচ্ছা তুমি কথাবার্তা বলো। আমি যাই, তৈরি হয়ে আসি। আমায় আবার এখুনি লাইব্রেরিতে যেতে হবে।

প্রস্থান।

অরুণ। মেশোমশায় পথের জন্যে ঘাবড়ে যাচ্ছেন বোধহয়। আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন মা। আমরা কোন অসুবিধে হতে দেব না।

সরমা। সে কি কথা! অসুবিধে হবে কেন বাবা?

অরুণ। বাবা বলছিলেন—আপনাদের জন্য যদি কিছু করা যায়, মনে বড় তৃপ্তি হবে। আচ্ছা মা, আপনাদের কোন দরকারেই কি আমরা লাগতে পারি নে?

সরমা। ভিখারির হাল দেখতে পাচ্ছ। তুমি তো বাবা বোকা ছেলে নও। সমস্তই বোঝ। ওঁর ঐ গতিক। কত আদরের মেয়ে,

সে আজকে টাকার ধান্দায় বাড়ি বাড়ি টিউশানি করে বেড়ায়। সকলের বড় ভাবনা, মেয়েকে যোগ্য পাত্রে দেওয়া। উনি নিজের খেয়ালে মেতে আছেন। কে কি করবে, কোথায় টাকাকড়ি, কোথায় বা ছেলে—

অরুণ। আমি বলি কি, দেশে গিয়ে মেশোমশায় ইরা দেবীর বিয়ের কথা বাবার কাছে যেন অতি অবশ্য বলেন।

সরমা। উনি বলবেন বিয়ের কথা! তবেই হয়েছে। আর মেয়েও তা বলতে দেবে না।

অরুণ। বিয়ের ব্যাপার এমনি-এমনি হবে কি করে? কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে।

সরমা। সে হয়তো হবে। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বিয়ে—উনি তাতে কখনো রাজি হবেন না। আর মেয়েও শুনতে পেলে ক্ষেপে যাবে।

অরুণ। কিন্তু সাহায্য বলতে শুধু টাকাকড়ির কথাই বা ভাবছেন কেন? সাহায্য তো কত রকমেই হতে পারে। ধরুন, বিয়ের ব্যাপারে পাত্র চাই সকলের আগে। [ইরাকে চা নিয়ে আসতে দেখে] গাছের সঙ্গে তো আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না! অবশ্য দিতে পারলে বড় মন্দ হত না। গাছকে গালমন্দ করুন আর দু-ঘা বসিয়েই দিন, গাছ কিছু বলতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ইরা চা নিয়ে আসে। সে বলে—

ইরা। কি, আমার কুচ্ছো হচ্ছে বুঝি?

সরমা। হ্যাঁ, হচ্ছে। মেয়েমানুষের অমন মেজাজ ভাল নয়। বলব কি বাবা, মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে আমার হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে। বিয়েথাওয়া ওর কপালে নেই। জেনেশুনে কোন পাত্তোর ঐ মনসা ঠাকরুনকে ঘরে তুলবে?

অরুণ। বলা যায় না মা। পাত্তোর কত রকমের আছে। মাথা-খারাপ থাকতে পারে। আবার মিনমিনে মেয়ে নয়, সিপাহিসাস্ত্রী যার পছন্দ, এমনিতরো হতেও পারে।

ইরা। [হেসে] শুনলে তো মা, মাথা-পাগলা ছাড়া তোমার মেয়ের গতি নেই। তার চেয়ে যেমন আছি সেই তো ভাল মা। কি দরকার ঝামেলা জোটানোর? নিন—চা'টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অরুণ চায়ের কাপ মুখে তোলে।

দেখুন তো ঠিক হয়েছে কিনা?

অরুণ ঘাড় নাড়ে।

ইরা। চিনির বদলে নুন দিইনি?

অরুণ। [হেসে] না। তবে ঠাণ্ডা, এই যা। ঠাণ্ডা চা-ই আমি ভালবাসি।

কাপটা নামিয়ে রেখে অরুণ সরমাকে প্রণাম করে।

তা হলে এখন আসি মা। বাবা পথ চেয়ে আছেন। মেশো-মশায় যেতে রাজি হয়েছেন, এ শুভ খবরটা তাড়াতাড়ি দিই গে।

সরমা। এসো বাবা।

অরুণ চলে গেল

বেশ ছেলেটি!

ইরা। ছেলেটি তো বেশ! কিন্তু যার-তার কাছে তোমায় সংসারের দুঃখধান্দা আর মেয়ের বিয়ে নিয়ে কাঁদুনি গাইতে দেখলে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

সরমা। আহা, মেয়ের যত আধিক্যেতা! মেয়ে থাকলে অমন সবাই বলে থাকে। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না।

ইরা। আমি বিয়ে করব না মা।

সরমা। হুঁ, তা করবে কেন! চিরকাল ধিঙ্গি হয়ে বেড়াবে!

তোমার সাধবাসনা না থাক, আমাদের আছে। পেটের ছেলেরা ফাঁকি দিয়ে গেল, তাদের জায়গা খালি রয়েছে।

ইরা। খালি থাকবে কেন, আমি তো রয়েছি মা! আমায় ছেলে বলে ভেবে নিতে পার না? মনে রেখো মা, ও আঙুরফল বড্ড টক। নাগালের মধ্যে আসবে না। ও ছেলে দেখে লোভ কোরো না। ওর বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। আর সে মেয়েও হঠাৎ একদিন আমি দেখে ফেলেছি। তোমাদের মেয়ে সেখানে টক্কর দিয়ে পারবে না।

ইরা চলে যায়। বিশ্বেশ্বর প্রবেশ করেন। তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর। হাতে ফাইল।

বিশ্বেশ্বর। বুঝলে, অরুণ ছেলেটি বড় সৎ। ও কক্ষণো বাজে কথা বলবে না। শুধু সভা হলে কে যেত? ফুলের মালার আর ক'টা পয়সা দাম যে তার জন্যে অত কষ্ট করে যাব? তা নয়—ও এক ভীষণ লোভ দেখিয়ে গেল, সেই জন্যেই যাচ্ছি।

সরমা। [সোল্লাসে] ওঃ! তোমাকেও তা হলে বলেছে? বড্ড ভাল ছেলে, ভাল হোক বাছার! দেখ, তুমি গিয়ে বেশ গুছিয়ে বলবে অরুণের বাবাকে।

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

সরমা। কি রকম করে কথাটা পাড়বে বল দেখি?

বিশ্বেশ্বর। আমি সোজাসুজি বলব যে সত্যি সত্যি যদি আপনার 'ভারতে ইংরাজ' বই ভাল লেগে থাকে, তাহলে আরও ভাল ভাবে যাতে কাজ করতে পারি আপনি সেই সাহায্য আমাকে করুন।

সরমা। না না, ওই বুঝি সোজাসুজি হল? বলবে, কন্যাদায়

উদ্ধার করুন। অরুণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ইরাকে বউ করে ঘরে তুলে নিন।

বিশ্বেশ্বর। এ আবার তুমি কি বলছ?

সরমা। ঠিকই বলছি। ও নিয়ে তোমার অত মাথা ঘামাতে হবে না গো! যাদের গরজ তারাই মাথা ঘামাচ্ছে। তুমি শুধু কথাটা অরুণের বাপের কানে তুলে দিও, তাহলেই বুঝতে পারবে।

বিশ্বেশ্বর। বলছ কি তুমি? তিনি অত বড়লোক, ইরার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে যাবেন কেন? গুণগ্রাহী মানুষ, সমাদর করে আমায় ডেকেছেন। আর, কোথাও কিছু নেই—আমি তাঁকে বেয়াই হতে বলব?

সরমা। হাঁ, বলবে। তুমি ওদের জাতে তুলে দিয়েছ। কি করে ওরা এখন ঋণ শুধবে, তাই ভেবে পাচ্ছে না। অরুণের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ইরাকে ওর পছন্দ।

বিশ্বেশ্বর। তুমি ভুল বুঝেছ। ছোঁড়াটার ইতিহাসে নিষ্ঠা আছে। তাই, পুরোন কাগজপত্রগুলো আমার হাতে তুলে দিতে চায়।

সরমা। ঐ কাগজপত্রের কথা না বললে তোমায় যে টেনে বের করা যায় না! মূলে হল, বিয়ের ব্যাপার। বিয়ের সম্বন্ধ ডাক্তারবাবুর কাছে তুলবে বলেই ঘটা করে নিয়ে যাচ্ছে—

বিশ্বেশ্বর। [সবিস্ময়ে] সম্বন্ধ! বিয়ের সম্বন্ধ? সে তো সাধারণ ঘটক দিয়েই হতে পারে। তার জন্যে আমায় কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাবে কেন?—না না, আমি তা পারব না।

পঞ্চানন এসে পড়ল।

পঞ্চানন, তুমি এ সময় হঠাৎ?

পঞ্চানন। সম্পাদক পাঠিয়ে দিলেন। অম্বুজাক্ষ ডাক্তারবাবু ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন। গো-মড়কে শকুনের পার্বণ—আমরা লিখব

তাঁকে নিয়ে। বুঝতেই পারছেন, সকল রকম মাল হাতে থাকা চাই আপনি বলেছিলেন, কাশীশ্বর সম্বন্ধে অনেক কিছু এখনো অজানা। নতুন আর কোন মালের সন্ধান পেলেন ?

বিশ্বেশ্বর। পেয়েছি বই কি! সেই জন্যেই তো মণিরামপুর যাচ্ছি! তুমিও চল না আমার সঙ্গে। দুর্গম পথ—তুমি সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়।

পঞ্চানন। মণিরামপুরে ? মানে, অম্বুজ ডাক্তারের বাড়ি যেখানে ?

বিশ্বেশ্বর: হ্যাঁ আমারও সেখানে পৈতৃক বাড়ি। অম্বুজ ডাক্তারের ছেলে এসেছিল। 'ভারতে ইংরাজ' পড়ে ডাক্তারবাবু ভারি খুশি। শনিবারে যাব, তুমি তৈরি হয়ে থাকবে।

পঞ্চানন। যে আজ্ঞে।

বিশ্বেশ্বর। কথা রইল তবে। আমি এখন লাইব্রেরিতে চললাম।

প্রস্থান।

পঞ্চানন। [সরমার দিকে চেয়ে] হঠাৎ অম্বুজ ডাক্তারের ছেলে এসেছিল ? কি ব্যাপার বলুন তো ?

সরমা। ব্যাপার আর কি! মণিরামপুর নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি। উনি কিছুতেই রাজি হন না। শেষে তিন সিন্দুক কাগজের লোভ দেখিয়ে ওঁকে রাজি করিয়েছে। আসল ব্যাপার হল, ইরাকে ছেলেটির বড্ড পছন্দ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের কথা পাড়ল।

পঞ্চানন। তাই নাকি ? চমৎকার ছেলেটি! তা ছাড়া ওদের অবস্থাও ভাল।

সরমা। কিন্তু ওঁকে দিয়ে তো কিছু হবে না পঞ্চানন। তুমি যাচ্ছ, বড্ড ভাল হল। কথাটা যদি সময় বুঝে অম্বুজ ডাক্তারের কাছে পাড়তে পার—

পঞ্চানন। পারব না মানে? দাদার লেখা ছেপে ছেপে যুগ-চক্রের ইজ্জত। আর আপনাদের জন্যে এইটুকু পারব না? কাগজের লোক আমরা—সামনে ইলেকশন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিয়ে অম্বুজ ডাক্তার বাপের সুপুত্তুর হয়ে দেবে।

চতুর্থ দৃশ্য

মণিরামপুরে ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায়ের বাড়ির বৈঠকখানা। পুরানো আমলের বাড়ি। ঘরের মাঝখানে ফরাস বিছানো। ফরাসের উপর কয়েকটি বাঁধান হুকা। বিরাট তালপাতার পাখা নিয়ে চাকর বাতাস করছে। ঘরের পিছন দিককার জানলা দিয়ে চকমিলানো বাড়ির বিশালত্ব আন্দাজ করা যায়। বৈঠকখানার লাগোয়া বারান্দা। ভিতরের দিকে লোক চলাচল করলে বৈঠকখানা থেকেই তা দেখা যায়। গ্রামের কয়েকজন প্রবীন ভদ্রলোক অম্বুজাক্ষের সঙ্গে বসে আছেন। অম্বুজাক্ষের গোমস্তা সহদেব বর্ধনও আছে।

সহদেব। কি বলব ভটচাজ্জি মশায়। ক'দিন আগে পর্যন্ত সাধন মিত্তিরের লোকেরা ইংরেজের পা চাটা—ইংরেজের খয়ের-খাঁ—বলে কি গালিটাই দিয়েছে! বাবু কলকাতা থেকে ঐ মোটা বইগুলো এনে দাগ দিয়ে দিয়ে বিলি করে দিলেন—অমনি যেন জোঁকের মুখে নুন। সাধন মিত্তিরের লোকেরা এখন আর টুঁ শব্দটি করতে পারছে না।

অম্বুজ। লোকের দোষ কি বল। এতকাল ধরে তারা যা সমস্ত শুনে এসেছে, সত্যি বলে জানত।

হন্তদন্ত হয়ে সতীশ প্রবেশ করল।

এই যে সতীশ! ব্যাপার কি? ওঁরা এসে পৌচেছেন?

সতীশ। আজ্ঞে হাঁ।

অম্বুজ। কিন্তু এত দেরি হল কেন?

সতীশ। দেরি কি আর সাধে হয় ডাক্তারবাবু? যা ভিড়! ভিড় ঠেলে সরকার মশায়কে পালকিতে তোলাই যায় না। এত ভিড় এ তল্লাটে কেউ কখনো দেখেনি!

অম্বুজ। বল কি? তা হলে বই বিলি করে বেশ কাজ হয়েছে বল। যারা বই পড়েছে, তারা লেখাপড়া না-জানা লোকের মধ্যেও কাশীশ্বরের কথা প্রচার করেছে তাহলে?

সতীশ। আজ্ঞে না। কাশীশ্বরের জন্য নয়। রামনিধি সরকারের নাতিকে দেখার জন্যে। রামনিধিকে লোকে আজও ঠাকুর-দেবতার মতন ভাবে। তবে এবারে আপনার ঠাকুরদাদা কাশীশ্বরেরও নাম-ডাক হল। জানেন ডাক্তারবাবু, হাটখোলার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সভায় লোকে আজ বসবার জায়গা পাবে না।

চক্রবর্তী। এতদিন আমরা কতবড় অন্যায়ই না করে এসেছি। ঋষিতুল্য কাশীশ্বর রায়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে এসেছি। গালাগালি দিয়েছি। দেখবেন, দেশসুদ্ধ মানুষ আপনাকে ভোট দিয়ে এইবারে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

অরুণের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—

অরুণ। যান, এবারে আপনারা দয়া করে সভায় চলে যান। সেই কলকাতা থেকে উনি ক্লান্ত হয়ে আসছেন। একটুখানি জিরিয়ে নিন—ঠিক ছ'টায় সভায় আবার এঁকে দেখতে পাবেন।

জনতা। হাঁ হাঁ, চল সভায় গিয়ে বসা যাক।

অরুণের সঙ্গে বিশ্বেশ্বর ও পঞ্চানন প্রবেশ করল। সকলে উঠে দাঁড়াল।

অম্বুজ। আসুন, আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক!

অরুণ অম্বুজাক্ষের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের পরিচয় করিয়ে দেয়।

অরুণ। আমার বাবা—

বিশ্বেশ্বর। [হেসে]—হ্যাঁ হ্যাঁ, চতুর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ—কাশীশ্বরের বংশধর, ও আমি দেখেই বুঝেছি।

অরুণ। [পঞ্চাননকে দেখিয়ে] বাবা, ইনি যুগচক্রের সহকারী সম্পাদক—পঞ্চানন সরখেল।

অম্বুজ। ও, আসুন! তুমি দেখ অরুণ, ওদিকে কি রকম কি বন্দোবস্ত হল।

অরুণ। আচ্ছা—

সহদেব ও অরুণের প্রস্থান।

অম্বুজ। বড় ক্লান্ত আপনারা। বিশেষ করে সরকার মশায়। সভা ছ'টার সময়—এখন সবে তিনটে। পুরো তিন ঘণ্টা এখনো দেরি। ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন।

বিশ্বেশ্বর। আপনার ছেলের কাছে শুনলাম কাশীশ্বর রায়ের আমলের অনেক পুরোন কাগজপত্র নাকি আছে।

অম্বুজ। হ্যাঁ, আছে বৈ কি! [দেয়ালের দু-খানা ছবি দেখিয়ে] এই দেখুন আমার পিতামহ কাশীশ্বরের ছবি। আর ওইটা বোধহয় আপনার পিতামহ রামনিধির।

বিশ্বেশ্বর। শুনলাম, তিনটে সিন্দুক নাকি কাগজে ঠাসা—

অম্বুজ। শুনেছেন ঠিকই। আরও ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে। ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ত। জানলা-দরজায় কপাট ছিল না একটু বৃষ্টি হলেই জলের সমুদ্দুর খেলত মেজের উপর। এই কিছুদিন হল সিন্দুক তিনটে একটা ভাল ঘরে এনে রাখা হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। হায় হায় হায়! মণিমাণিক্য অমন ভাবে রাখে কখনো!

অম্বুজ। আপশোষের কারণ নেই। এখনো যা আছে, সে এক গন্ধমাদন।

বিশ্বেশ্বর। তাই নাকি? চলুন—চলুন—দেখে আসি।

অম্বুজ। এখন? কষ্ট করে এলেন, বিশ্রাম করুন। কাগজপত্র সকাল বেলা দেখবেন।

বিশ্বেশ্বর। সকাল? না না, চলুন—একটিবার এখনই দেখে আসি। নইলে স্বস্তি পাব না।

সতীশ। ডাক্তারবাবু, দেখিয়ে দিন এক নজর সরকার মশাইকে। না দেখে উনি স্থির হতে পাবেন না, সভার মধ্যে ছটফট করবেন।

বিশ্বেশ্বর। সত্যিই। চলুন ডাক্তার বাবু, চলুন—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অম্বুজ ডাক্তারকে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যেতে হয়। দু-এক পা অগ্রসর হয়ে বিশ্বেশ্বর বলেন—

পঞ্চানন, তুমি আসবে না?

পঞ্চানন। পচা কাগজের রস আমি তো গ্রহণ করতে পারব না। বরং আপনি রস নিংড়ে বের করে দেবেন, সেই সময় চুমুক মারব।

বিশ্বেশ্বর ও অম্বুজাক্ষ ভিতরে চলিয়া গেলেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন।

ভট্টচার্য। সাধক মানুষ, জ্ঞানতপস্বী।

চক্রবর্তী। টাকাপয়সা, আরাম-আমোদ ধুলোমাটির মতন এঁদের কাছে। কি রকম পাগলের মতো কাগজের ঘরে ছুটলেন, দেখলে না?

সতীশ। কোন বংশের মানুষ, সেটা ভুলবেন না! ওঁরই ঠাকুরদাদা রামনিধি আর এক পাগল—আমাদের চাষীদের জন্য জলজ্যান্ত প্রাণটা দিয়ে দিলেন।

ভট্টচার্য। দেখা তো হয়ে গেল চক্কোত্তি। এবারে চলো হাট-খোলার দিকে যাওয়া যাক।

ভদ্রলোকেরা চলে গেলেন।

সতীশ। [পঞ্চাননকে] জানেন বাবু, আমাদের পাড়ায় এক পোড়োভিটে আছে। রামনিধির ভিটে। ভিটের উপর সেই আমলের এক তেঁতুলগাছ। ইচ্ছে করছে, সরকার মশাইকে একটি বার সেখানে নিয়ে যাই।

পঞ্চানন। বেশ তো! কিন্তু শুধু ভিটে নয়। জমিজমা-বাগান-পুকুরও আছে। বার ভূতে নাকি বেদখল করে খাচ্ছে।

সতীশ। এঁদের কারো যাওয়া-আসা নেই বলেই এই অবস্থা। সরকার মশায় বছরে একবার ত্ব'বার পদধূলি দিন না! ওর এক কাঠা ভুঁই যদি বেদখল থাকে, দেখা যাবে তখন। রামনিধির নাতির জন্যে আমরা গ্রামসুদ্ধ লোক, এইটে আপনি জেনে যান।…আচ্ছা, আমি তাহলে আসি বাবু। চেষ্টা করে নিয়ে যাবেন সরকার মশাইকে।

পঞ্চানন। আচ্ছা।

সতীশ চলে গেল। একদিক থেকে অরুণ ও অপর দিক থেকে অম্বুজাক্ষ প্রবেশ করলেন।

অম্বুজ। সভার জায়গা কি রকম দেখে এলে?

অরুণ। সমস্ত হয়ে গেছে বাবা। অশ্বত্থতলায় বেদি—দেবদারু-পাতা আর গাঁদাফুলে সাজিয়েছে। আলপনা দিয়েছে।

অম্বুজ। উনি বেদির উপরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবেন-টলবেন তো?

পঞ্চানন। বলা যায় না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পও ফেঁদে বসতে পারেন।

অম্বুজ। এঁ্যা! বলেন কি?

পঞ্চানন। আজ্ঞে হাঁ। বক্তৃতা ওঁর আসে না। তার চেয়ে কাজের কথা বলি অরুণ বাবু। আপনি বেশ ভাল করে একটা বক্তৃতা লিখে ওঁকে পড়িয়ে পড়িয়ে রপ্ত করে দিন। নইলে কেলেঙ্কারি হতে পারে।

অম্বুজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাও। বক্তৃতা লিখে ফেলগে। সময় নষ্ট করো না।

অরুণ চলে গেল।

পঞ্চানন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব ডাক্তারবাবু।

অম্বুজ। অনুরোধ ?

পঞ্চানন। আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ো মানুষটিকে যে জন্যে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসেছি—

অম্বুজ। বেশ তো। বলুন, কি বলতে চান।

পঞ্চানন। বিশ্বেশ্বর বাবু কন্যাদায়ে বড়ই বিব্রত। তাই—

অম্বুজ। তা আমার যতদূর সাধ্য, তাতে ত্রুটি হবে না।

পঞ্চানন। সাধ্য পুরোপুরি আছে। বলছিলাম কি, ঐতিহাসিক আত্মীয়তা আপনাদের দুই বংশে। নতুন করে সেইটে ঝালিয়ে নিন না।

অম্বুজ। [ভ্রূকুটি করলেন] মানে ?

পঞ্চানন। বিশ্বেশ্বর বাবুর মেয়েটিকে আপনার ছেলের বউ করে নিন। অযোগ্য হবে না।

অম্বুজ। দেখুন, ইলেকশনের তোড়জোড়ে বড় বিব্রত। এসব কিছুই এখন মাথায় আসছে না। ছেলে, ছেলের মা, এদেরও মতামত চাই। (সুহাসিনী কোন দিকে যাচ্ছেন, পিছন দিককার জানালা দিয়ে তাঁকে দেখা গেল) ঐ যে, যাচ্ছেন উনি। শোন, এদিকে এসো একটিবার।

সুহাসিনী প্রবেশ করলেন। পঞ্চানন তাঁকে প্রণাম করল।

এই পঞ্চানন বাবু অরুণের বিয়ের কি কথা বলছেন বিশ্বেশ্বর বাবুর মেয়ের সঙ্গে। শোন—

অম্বুজাক্ষ তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

পঞ্চানন। ডাক্তারবাবু কথাটা কানেই নিলেন না। পাশ কাটাতে চান মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী। না না, উনি এখন বড্ড ব্যস্ত কিনা! তাই—

পঞ্চানন। ও! তা যাক। বলছিলাম কি, কাশীশ্বরের কথা লিখে বিশ্বেশ্বর বাবু ইলেকশনের এত সুবিধা করে দিলেন। সংসারে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকবে না? ডাক্তারবাবু আপনাদের দেখিয়ে দিলেন। বললেন—ছেলে আছে, ছেলের মা আছেন—

সুহাসিনী। মেয়ে কেমন?

পঞ্চানন। আমার মুখে কি শুনবেন? আপনার ছেলেকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না। তিনি তো হামেসাই আসা-যাওয়া করেন বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ি। খুলেই বলি, অরুণবাবুর ইচ্ছেমতো আপনাদের কাছে প্রস্তাব তুলেছি।

সুহাসিনী। দেখবেন, অরুণের পছন্দ-করা মেয়ে—এ কথা যেন ওঁর কানে না যায়। খবরদার! বড্ড জেদি মানুষ। তাড়াহুড়ো করবেন না। মনমেজাজ বুঝে শিগগিরই আমি একদিন মেয়ে দেখতে পাঠাব।

পঞ্চানন। বেশ—

পঞ্চম দৃশ্য

কলকাতায় অম্বুজাক্ষ ডাক্তারের বাড়ি। রোগি দেখবার ঘর। ঘরের মাঝখানে টেবিল। টেবিলের উপর ডেট-কার্ড, কাগজ-চাপা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি। কয়েকখানা চেয়ার। জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এক্সরে-প্লেট নিয়ে অপেক্ষা করছেন। হরিহর প্রবেশ করল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন—

ভদ্রলোক। ডাক্তারবাবু ফিরেছেন?

হরিহর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। বাবু এলেন বলে।

ভদ্রলোক। ডাক্তারবাবু ডাকে গিয়েছিলেন?

হরিহর। ডাকে নয়—ভোটে। আজকাল পেরাই তাইতো দেশে গিয়ে থাকছেন। এ পোড়া ভোট না হয়ে গেলে আর শান্তি নেই। ডাক্তারবাবু কোথায়—কি বৃত্তান্ত—সারাদিন জবাব দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

হরিহরের প্রস্থান। অম্বুজাক্ষ ঢুকলেন। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। অম্বুজাক্ষ বলেন—

অম্বুজাক্ষ। কি? আপনার ছেলের এক্সরে রিপোর্ট এনেছেন?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

এক্সরে-প্লেট ভদ্রলোক এগিয়ে দিলেন। টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে অম্বুজাক্ষ পরীক্ষা করলেন।

অম্বুজ। রিপোর্ট ভালই। চিন্তার কারণ নেই। ওষুধ ইনজেকশন যেমন চলছে, তেমনিই চলবে। দিন পনের বাদে আপনার ছেলেকে একবার নিয়ে আসবেন, দেখব।

এক্সরে-রিপোর্ট হাতে নিয়ে পকেট থেকে নোট বের করে ভদ্রলোক ডাক্তারের ফী দিচ্ছেন।

ভদ্রলোক! তা হলে পনের দিন পরে আসব।

অম্বুজ। তাই আসবেন। এর জন্য ফীয়ের দরকার নেই। আসুন।

ভদ্রলোক দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। অরুণাক্ষ প্রবেশ করল।

বিশ্বেশ্বর বাবুর কাছে আর গিয়েছিলে? মণিরামপুর থেকে সেই তো কাগজপত্রের পাহাড় বয়ে নিয়ে এলেন,—নতুন আর-কিছু লিখলেন?

অরুণ। তা বলতে পারিনে। সেই সব কাগজ নিয়েই তো

পড়ে আছেন। পড়ছেন, নোট নিচ্ছেন। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। লোকজন গেলে বিরক্ত হন, সেই জন্যে আমি আর যাইনে।

কৃতান্ত প্রবেশ করল।

আরে, কৃতান্ত বাবু যে! যুগচক্রের সম্পাদক নিজে চলে এলেন? ব্যাপার কি?

কৃতান্ত। ডাক্তার বাবুর কাছে দরকার। জরুরি কথা, গোপনে বলব। মাপ করবেন, আপনার সামনেও নয় অরুণাক্ষ বাবু—

অরুণ। আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। বাবাকে বলুন আপনার বক্তব্য।

অরুণাক্ষ চলে গেল।

কৃতান্ত। নাম তো শুনলেন—কৃতান্ত বিশ্বাস। নাম নয়—বদনাম। ঐ ভাঙিয়ে খাই। দায়ে পড়লে বড়লোকেরা ডাকাডাকি করেন। তা আপনি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন ডাক্তারবাবু—এখনো তো আমাদের খোঁজখবর নিলেন না!

অম্বুজ। এই যাবো-যাবো করছিলাম! কিন্তু কাজকর্মের ঝঞ্ঝাটে—

কৃতান্ত। আমিও তাই ভাবছিলাম। যুগচক্রের কথা ভুলে থাকবেন, সে হতে পারে না। তা বিশ্বেশ্বর-দা'র কলমের খোঁচায় আপনার বাজার তো খুব গরম। এই নাম ভোট পর্যন্ত যদি টিকিয়ে রাখতে পারেন, তরতর করে বেরিয়ে যাবেন। আর যুগচক্র তো জানেন সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যে লিখবে না।

অম্বুজ। ও-কথা বলবেন না। ভূতনাথ গুঁইয়ের মতো মানুষের উপরেও কত গুণপনা চাপিয়ে আমার বিপক্ষে লিখেছিলেন আপনারা করর্পোরেশন ইলেকশনের সময়।

কৃতান্ত। সে-ও সত্যি। যুগচক্র যা লিখবে সমস্ত সত্যি। তবে

সত্যিকে সত্যি বলে লিখতে রেট কিছু কম। মিথ্যেকে সত্যি করতে হলে ডবল রেট। ভূতনাথ গুঁই তাই দিয়েছিলেন। তা যাক। কাশীশ্বরের সঙ্গে আপনার তুলনা করে এর মধ্যে লিখে ফেলেছি অনেকটা। দেখুন না একটু চোখ বুলিয়ে—

ফোলিও-ব্যাগ খুলে একতাড়া কাগজ বের করে কৃতান্ত অম্বুজাক্ষর হাতে দিল। অম্বুজাক্ষ উলটে-পালটে দেখলেন।

অম্বুজ। (হাসি মুখে)—খাসা হচ্ছে। শেষ করে ফেলুন।

কৃতান্ত। ইচ্ছে তো তাই। কিন্তু উৎসাহ চুপসে যাচ্ছে। ছাপি কোথায়?

অম্বুজ। কেন কেন? আপনারই তো ছাপাখানা রয়েছে—

কৃতান্ত। তার যা অবস্থা! সে আর কি বলব? নড়বড়ে মেসিন, ভাঙা টাইপ। একটা ব্যবস্থা করে দিন ডাক্তারবাবু, সাজিয়ে-গুছিয়ে এমন লেখাটা যাতে সকলের চোখে ধরতে পারি।

অম্বুজ। কত লাগতে পারে?

কৃতান্ত। তালিতুলি-দেওয়া এক পুরানো মেসিন দেখে এসেছি। মেসিন আর টাইপের দরুন সবসুদ্ধ হাজার দশেক দিন আমায়। ধার হিসাবে দিন, শোধ করব।

অম্বুজাক্ষ চুপ করে রইলেন।

ও! কুণ্ঠিত হচ্ছেন? তাহলে চাইনে। আপনার বাড়ি আমি নিজে এসেছি, ওদিকে সাধন মিত্তিরের কিন্তু উল্টো ব্যাপার। তারা আমার আপিসে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে। নমস্কার!

রাগ করে কৃতান্ত উঠে পড়ে। অম্বুজাক্ষ হাত ধরে বসালেন।

অম্বুজ। উঠছেন কেন, সে কি কথা! তবে কিনা এখন নানান দায়ঝক্কি—সব টাকা দিতে পারব না। কিছু দিচ্ছি, ইলেকশনের পরে বাকিটা দেব।

কৃতান্ত। (হেসে উঠল) ইলেকশন চুকে গেলে তখন কি মনে করতে পারবেন অধমের কথা? কেউ করে না, আপনিই বা করতে যাবেন কেন?

অম্বুজ। আচ্ছা, দেখি একটু বিবেচনা করে।

কৃতান্ত। বেশ তো, করুন আপনি বিবেচনা। দিন চারেক পরে না হয় আসব।

আগের লেখাটা ফোলিওর খোপে পুরে কৃতান্ত পকেট থেকে অন্য কাগজ বের করল।

এই দেখুন, লেখার উপসংহারটা কি রকম হবে, তা-ও কেঁদে ফেলেছি। কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপব। শেষ কিস্তিটা ইলেকশনের আগে দিতে চাইনে। আপনার অসুবিধা হবে, সেটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। আচ্ছা, পড়ি কয়েকটা লাইন—কেমন? (পড়ছে) —কাশীশ্বর রায় অত্যন্ত চতুর বলিয়া তাঁহার ছদ্মরূপ দেশবাসী তখন ধরিতে পারে নাই। আসলে তিনি অতি ইতর, স্বদেশদ্রোহী, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক—

অম্বুজাক্ষ কৃতান্তের হাত থেকে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিলেন। পড়লেন কিছু কিছু।

অম্বুজ। বিলকুল মিথ্যেকথা। কাশীশ্বর থেকে শুরু করে আমাদের সকলের উপর আপনি কালি ছিটিয়েছেন। বিশ্বেশ্বর সরকারের মতো পণ্ডিত মানুষ এত প্রমাণপ্রয়োগ দিয়ে যা বলেছেন, তার উপরে এই সব লিখলে নিষ্কৃতি পাবেন না আপনি। মানহানির দায়ে পড়ে যাবেন।

কৃতান্ত। দিন ওটা। (অম্বুজাক্ষ মুখ ফিরিয়ে রহিলেন) দেবেন না? বেশ, লেখাটা রইল। আমার আলাদা কপি আছে। আপনি বরঞ্চ এর মধ্যে দু-একজন উকিলের সঙ্গে মানহানির শলা পরামর্শ সেরে রাখুন। ইচ্ছে হলে বিশ্বেশ্বর দাদার কাছে গিয়েও দেখতে পারেন। নমস্কার! আসি ডাক্তারবাবু—

কৃতান্ত ভক্তিভরে নমস্কার করে চলে গেল। অম্বুজাক্ষ স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। বার কয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করে তারপর ডাকলেন—

অম্বুজ। অরুণ!

অরুণ প্রবেশ করল।

অরুণ। আমায় ডাকছিলেন বাবা?

অম্বুজ। হ্যাঁ। গাড়ি বের করতে বলো। আর তুমিও তৈরি হয়ে নাও। এখনই আমার সঙ্গে বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ি যেতে হবে।

অরুণ। এখুনি?

অম্বুজ। হ্যাঁ। কৃতান্ত বিশ্বাস শাসিয়ে গেল। যাও, শিগগির তৈরি হয়ে এসো।

অরুণ চলে গেল। সুহাসিনী প্রবেশ করলেন।

সুহাসিনী। ছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

অম্বুজ। বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ি। ভাবছি, বিশ্বেশ্বর বাবুকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরব। ওঁর কথা লোকের কাছে বেদবাক্য।

সুহাসিনী। তা হলে ঐ সঙ্গে মেয়েটাও দেখে এসো। এতদিন না যাওয়াটা তোমার ভারি অন্যায় হয়েছে। শুনেছি, ভাল মেয়ে—

অম্বুজ। আমিও তাই শুনেছি। নিশ্চয় দেখব। প্রতুল দত্ত নমিনেশন নিয়ে বড় খেলাচ্ছে। ওর বোনের মেয়ের সঙ্গে হবে না। অরুণকে নিয়ে যাচ্ছি, সে চেনে বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ি। মেয়ে দেখে পাকা-কথা দিয়ে আসব আজকে। [অরুণ প্রবেশ করল] গাড়ি বেরুল?

অরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম্বুজ। চল—

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের বাড়ি। সন্ধ্যাকাল। বিশ্বেশ্বর ছোট্ট ঘরখানায় লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত। ডেস্কের সামনে ক্ষীণাভ বাতি জ্বলছে। সরমা এক কাপ চা দিয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন, এমন সময় কিশোরীবালা হন্তদন্ত হয়ে এলো।

কিশোরীবালা। শিগ্রি এসো মা ইদিকে, শিগ্রি এসো। কুটুম্ব—

সরমা। কুটুম্ব ?

কিশোরী। হ্যাঁ গো। দিদিমণির সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্ছে সেই তিনি। আর সঙ্গে এক কোট-পেণ্টলাল-পরা লোক। গলি দিয়ে আসছেন। দেখে ছুটতে ছুটতে এইছি।

সরমা। তা হলে অরুণের বাবা। দেখ দেখি—খবর না দিয়েই চলে এলেন। এদিকে মেয়ে তো পড়াতে বেরিয়ে গেছে। তুই এক কাজ কর কিশোরী, দৌড়ে কিছু জলখাবার নিয়ে আয় দোকান থেকে।

কিশোরী। আচ্ছা মা—

কিশোরীবালা চলে গেল। অরুণ ঘরে ঢুকল, সঙ্গে অম্বুজাক্ষ। সরমা ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিশ্বেশ্বর চোখ থেকে চশমাটা খুলে বলেন—

বিশ্বেশ্বর। কে ? কারা ? হুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন—এখানে কাজের সময় গণ্ডগোল করবেন না। ও ঘরে যান, ও ঘরে গিয়ে বসুন।

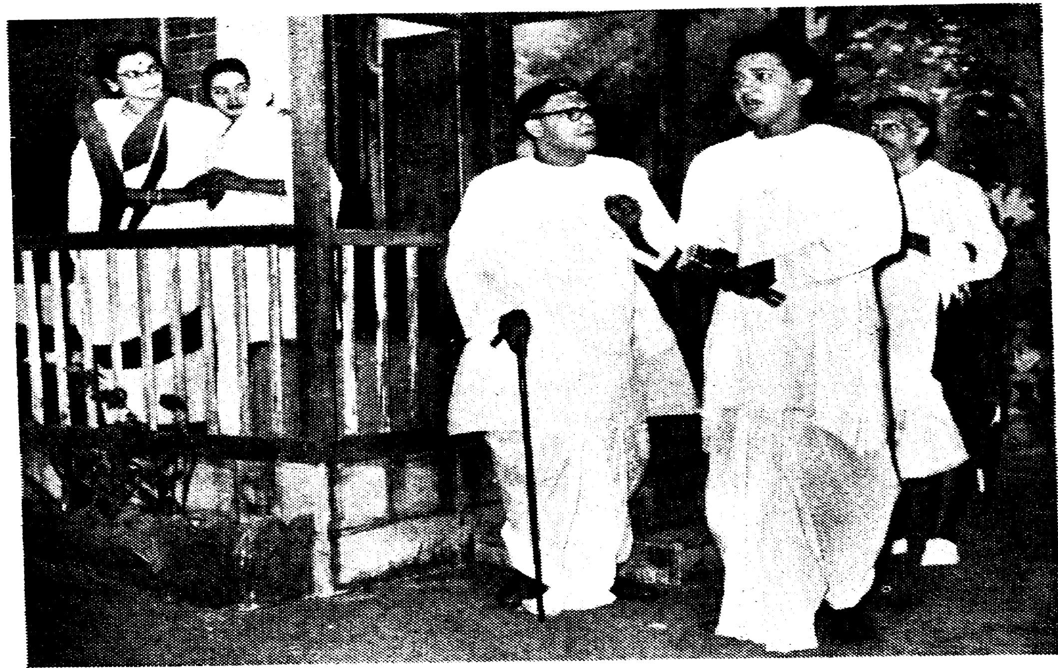
অম্বুজ। আপনার সাধনপীঠ দেখতে এলাম ভায়া। অন্য ঘরে গেলে তো হবে না। এর মধ্যেই কোনখানে একটু জায়গা করে বসতে হবে।

অম্বুজাক্ষ কিছু কাগজপত্র এক পাশে সরিয়ে বসবার ব্যবস্থা করলেন।

বিশ্বেশ্বর। [এতক্ষণে অম্বুজকে চিনতে পেরে] ওঃ, ডাক্তারবাবু !



বিশ্বেশ্বরের ঘর। বিশ্বেশ্বর ও ইরা (২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)



ডাকবাংলো। অম্বুজাক্ষ, সহদেব, সুহাসিনী ও ইরা (৩য় অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)

আহা-হা, কাগজপত্রের উপর চেপে বসলেন যে! ওরে, ও কিশোরীবালা, কোথায় গেলি? এত বড় মানুষটি এখানে বসে পড়লেন যে!

অম্বুজ। তা কি হয়েছে? অত পর ভাবছেন কেন আমায়? রামনিধি আর কাশীশ্বর সেই আমলের দুই দিকপাল। তাঁদের দেহ দুটোই শুধু আলাদা ছিল, কিন্তু—

বিশ্বেশ্বরের কথার মাঝে অম্বুজাক্ষ মুখে সিগারেট নিয়ে দেশলাই জ্বালতে গেলেন। বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলেন—

বিশ্বেশ্বর। ও কি, করছেন কি? চুরুট ধরাচ্ছেন? বাইরে যান আপনি। বারান্দায় চেয়ার আনিয়ে দিচ্ছি। একটা ফুলকি যদি পড়ে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অম্বুজাক্ষ চুরুট আর দেশলাই পকেটে রাখলেন।

অম্বুজ। এই থাকল দাদা। ব্যস্ত হবেন না। বিদ্‌ঘুটে এক নেশা। স্থানকালের বাছবিচার থাকে না, ভুলে যাই। তা যাক, মণিরামপুর থেকে সেই যে একগাদা কাগজপত্র বয়ে নিয়ে এলেন, কিছু কাজ হল তা দিয়ে?

বিশ্বেশ্বর। কাজ হবে না মানে? অশেষ অনুগ্রহ আপনার। যা দিয়েছেন হীরার ওজনে তার দাম হয় না। বিস্তর নতুন নতুন কথা জানা যাচ্ছে।

অম্বুজ। [সাগ্রহে] কাশীশ্বরের সম্বন্ধে আর কিছু পেলেন?

বিশ্বেশ্বর। পাই নি আবার! যত পাচ্ছি, ততই আমার তাক লেগে যাচ্ছে। এখন দেখছি পুরানো 'ভারতে ইংরাজ' লোকের কাছে হাজির করাই শক্ত হবে। অন্তত পক্ষে নতুন এক পরিশিষ্ট জুড়ে না দিলে পাঠকরা উল্টো রকম বুঝে বসে থাকবে।

অম্বুজ। পরিশিষ্ট ছাপবার খরচা কিন্তু আমার। চট করে বইটা

বের করে লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে ইলেকশনে কাজে লাগবে।

কিশোরীবালা ঘরে ঢুকে ইশারায় অরুণকে কি বলছে। অম্বুজাক্ষ হেসে বললেন—

অম্বুজ। বুঝেছি, বুঝতে পেরেছি। না খেয়ে নড়ছি না আমরা। তোমার মাকে বল চায়ের জল চাপিয়ে দিতে। এ তো নিজেরই ঘরবাড়ি আমার—

হাসতে হাসতে কিশোরী চলে গেল। অম্বুজ বললেন—

অম্বুজ। হ্যাঁ। আত্মীয়াধিক আত্মীয় আমরা—

বিশ্বেশ্বর। না না। ভুল—ভুল, বিলকুল মিথ্যে। রামনিধি আত্মীয় ভাবতেন বটে, কিন্তু কাশীশ্বর বরাবরই তাঁর সঙ্গে ছলনা করে এসেছেন।

অম্বুজ। ছলনা করে এসেছেন? কিন্তু 'ভারতে ইংরাজ' বইয়ে আপনি যে লিখেছেন, এক-ধ্যান এক-জ্ঞান দুজনের—

বিশ্বেশ্বর। তাহলে বুঝুন ইতিহাস কী বস্তু! আপনার দেশের বাড়ি থেকে কাগজপত্তোর নিয়ে এসে আমার পাঁচ-পাঁচটা বছরের সমস্ত খাটুনি একেবারে উলটে-পালটে গেল। আগের লেখার আর কোন দামই রইল না।

অরুণ। কি বলছেন মেশোমশাই?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ বাবা। কাশীশ্বর আসলে নীলকর সাহেবদের চর ছিলেন। আর রামনিধিকে চাষাভূষারা দেবতার মতো ভক্তি করত। গ্রামাঞ্চলে থাকলে রামনিধিকে ইংরেজ ধরতে পারত না। কাশীশ্বর নীলকরের টাকা খেয়ে বন্ধু সেজে রামনিধিকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে নিয়ে ফাঁদের মধ্যে ফেলে ধরিয়ে দিলেন।

অম্বুজ। আপনি লিখেছেন এ কথা?

বিশ্বেশ্বর। আমায় কিছু বানিয়ে লিখতে হয় নি। আপনার কাছ থেকে যে কাগজপত্তোর এনেছিলাম তার মধ্যেই অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

অরুণ। হতে পারে না মেশোমশায়।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু যতক্ষণ আবার উল্টো কিছু না পাচ্ছি, আমাকে এই লিখে যেতে হবে বাবা।

অম্বুজ। দেখুন, নিজে চলে এসেছি আপনার কাছে। কাগজ-পত্র তো আমিই আপনাকে দিয়েছিলাম।

বিশ্বেশ্বর। বিদ্যোৎসাহী মহানুভব আপনি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাগজপত্র দিলেন, আর কী সমাদরটাই না করলেন !

অম্বুজ। এই কি তার প্রতিদান ? কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন। আমি হাতজোড় করছি আপনার কাছে—

বিশ্বেশ্বর। আমি আর কি করব ? উপায় নেই। কাগজ-পত্র পড়ে দেখুন—তারপর আপনার হাতে কলম গুঁজে দিলে আপনিও ঠিক এমনি লিখবেন।

অরুণ। 'ভারতে ইংরাজ' বই-এ যা লেখা আছে, সেই অবধিই থাকুক মেশোমশাই। মনে করুন, আপনি পরের কাগজ কিছু পান নি।

বিশ্বেশ্বর। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে তুমি এ কথা কি করে বলছ বাবা ? সত্যকে গুম করে ফেলব—সেটা কেমন করে হয় !

অম্বুজ। হতেই হবে। হবে এই জন্যে যে আপনার কন্যাদায়। আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে। আমি আজকে পাকাপাকি করে যাব বলে এসেছি। আপনার মেয়ের শ্বশুরকুল অপমানিত হবে—আশা করি, এটা আপনি চান না ?

বিশ্বেশ্বর। না না, সে কি কথা !

অম্বুজ। অজানা অচেনা সেকেলে ক'টা মরা মানুষ—তাদের চেয়ে আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই আপনার বেশি আপন। মেয়ের প্রতি

আপনার কর্তব্য আছে। যা-কিছু লিখেছেন, ছিঁড়ে ফেলে দিন। পচা কাগজপত্র যা নিয়ে এসেছেন, দেশলাই জ্বেলে পোড়ান। আপনার মায়া লাগে তো আমায় দিন।

অম্বুজ পকেট থেকে দেশলাই বের করেন। বিশ্বেশ্বর কাগজগুলো বুকের মধ্যে চেপে ধরেন। অম্বুজাক্ষ ও অরুণ উঠে দাঁড়ান। অম্বুজ বিরক্ত হয়ে বললেন—

অম্বুজ। আচ্ছা ভাবুন। যদি মত বদলায় তো খবর পাঠাবেন। এই মাসের ক'টা দিন চুপচাপ থাকব। তারপর আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ।

অম্বুজাক্ষ ঘুরে দাঁড়ালেন। এই সময়ে সরমা ও কিশোরীবালা দু-থালা খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। অম্বুজাক্ষর কথাগুলো সরমার কানে গেল। তিনি লজ্জিত ভাবে পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। অম্বুজাক্ষ বলেন—

অম্বুজ। মন বড্ড বিচলিত। খাওয়ার মতো অবস্থা নেই, মাপ করবেন। বেয়ান বলে ডেকে যাব—সেই আশা নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু বাধা পড়ে যাচ্ছে। কোন দিন যদি সুরাহা হয়, আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে যেতে পারি, সেই দিন আমোদ করে খেয়ে যাব।

অম্বুজাক্ষ চলে গেলেন। অরুণও যাচ্ছিল, সরমা তাকে ডেকে বললেন—

সরমা। অরুণ, কি হল বাবা?

অরুণ। মেসোমশাইকে বুঝিয়ে বলুন। উনি যে কী জেদ ধরেছেন, উনিই জানেন। নতুন যা লিখেছেন তা থেকে কিছু বাদ-সাদ দিয়ে মোলায়েম করেও তো লেখা যায়! এতে পুরোপুরি মিথ্যেও হয় না, অথচ সব দিক বজায় থাকে। আপনি বুঝিয়ে বলুন। আমি কাল সকালে আসব।

অরুণ চলে গেল। সরমা অগ্নিমূর্তি হয়ে বিশ্বেশ্বরকে বলেন—

সরমা। বলি, কি সব ছাইভস্ম লিখেছ?

বিশ্বেশ্বর। ছাইভস্ম! আমি ছাইভস্ম লিখি? একটু যার জ্ঞানবুদ্ধি আছে, সে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না।

সরমা। অরুণদের বংশের ওপর কেন তুমি কালি ছিটিয়েছ?

বিশ্বেশ্বর। কিছুই করি নি আমি, যা করবার কাশীশ্বর রায়ই করে গেছেন। কাশীশ্বরের নিজের হাতের লেখা পড়ে দেখতে পার। এর মধ্যে মনগড়া কিছু নেই।

একটা লেখা-কাগজ সরমার দিকে এগিয়ে দেন। সরমা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেন। বিশ্বেশ্বর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

সরমা। লেখা লেখা আর লেখা! লেখার জন্যে জ্বলেপুড়ে মরছি।

বিশ্বেশ্বর। আহা-হা! এ কি করলে বড় বৌ।

সরমা। সারা দিনরাত ভূতের বেগার খাটছ—কিন্তু সংসারের কি হাল হয়েছে, সেটা দেখতে পাও কি? চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছ, মেয়েটা ট্যুইশানি করে নানান ধান্দায় সংসার চালায়। ছেলের বাপ আজ পাকা-কথা বলতে এসেছিলেন। তুমি কিনা বাপ হয়ে দরজা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দিলে! সমস্ত আজ আগুনে পোড়াব —পুড়িয়ে সংসারের আপদ-শান্তি করব।

ইরা এসেছে, সরমা তা টের পান নি। রাগে গরগর করে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বিশ্বেশ্বর ইরাকে দেখে বলেন—

বিশ্বেশ্বর। কি করা যায়? আচ্ছা, তুই-ই বল মা। এ হল ইতিহাস—নাটক-নবেল নয় যে কল্পনায় বানিয়ে বানিয়ে লিখব।

ইরা নিঃশব্দে এসে বাপের গা ঘেঁষে বসে।

এই ফাইলটা। দু-হপ্তা ধরে বেছে বেছে যত দরকারি কাগজ এর মধ্যে রেখেছি। কাশীশ্বরের যত মৃত্যুবাণ এই একটা তূণে। যেটা

খুশি তুই টেনে নিয়ে পড়। একেবারে প্রত্যক্ষ সাক্ষি। এদের সামনে কেমন করে আমার কলমে মিথ্যে বেরুবে?

ইরা সস্নেহে বাপের গায়ে-মাথায় হাত বুলায়।

অথচ করতেই হবে কিছু! তোর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, তোর মা রাগারাগি করছে। [সহসা উত্তেজিত হয়ে] নাঃ, এই কলমই হল কাল—

কলম ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পরে ফাইলটা ছু ড়তে গিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।

বিশ্বেশ্বর। কাশীশ্বরকে সবাই ঘৃণা করত। আমিই মহৎ করে গড়লাম। পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে তিলে তিলে আমার সৃষ্টি। আবার আমিই তাকে শক্তিশেল হানছি—এ কি আমার কম দুঃখ রে ইরা!

ইরা। বাবা, ঘুমোও তুমি। রাত হয়েছে। সারা দিন আজ বড্ড খেটেছ। ঘুমোও—

বিশ্বেশ্বর। ঘুম আমার হবে না—

ইরা। হবে। ঘুমোও—ঘুমোও—ঘুমোও—

ইরা বিশ্বেশ্বরকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ফাইলটা তুলে নেয়। ইরার হাতের উপর বিশ্বেশ্বরের একখানা হাত গিয়ে পড়ল। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

বিশ্বেশ্বর। কে? কে? কে তুমি?···ইরা? তোর হাতে কি রে? লুকোস কেন?

বিশ্বেশ্বর সুইস টিপে আলো জ্বাললেন। সন্ত্রস্ত ইরার হাত থেকে ফাইল পড়ে গেল।

বিশ্বেশ্বর। এসব কেন নিয়েছিস?

ইরা। চুরি করতে এসেছিলাম বাবা। এই লেখার জন্যে সংসারে যত অশান্তি। রাগারাগি করে মা আজ উনুনে হাঁড়ি চাপালেন না, না খেয়ে শুয়ে পড়লেন। তুমিও ঘুমোচ্ছ। কিন্তু আমার চোখে

ঘুম নেই। তাই ভাবছিলাম, কাগজগুলো বিদেয় করতে না পারলে নিস্তার নেই—

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, ঠিক—ঠিক বলেছিস মা! সর্বনেশে কাগজ। সোনার ছেলে অরুণ এরই জন্যে মুখ চুন করে চলে গেল। রাত দুপুরে তোর চোখে ঘুম নেই, বাপের ঘরে চোর হয়ে ঢুকেছিস। হ্যাঁ, আমিই তোর শত্রু। বড়বৌ মিথ্যে বলে নি। তুই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সকল দিক সামলে বেড়াস—আর আমিই কিনা তোর আখের নষ্ট করছি মা!

বিশ্বেশ্বর কেঁদে ফেললেন। ফাইল মেয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে—

নিয়ে যা মা। বড় লোভের জিনিস, আমার কাছে আর রাখব না। তোর পথের কাঁটা—তুই-ই নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলগে। তুই আর তোর মা দেশলাই ধরিয়ে ঘরের সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে দে। আমায় দায়মুক্ত কর মা—আবার আমি চাকরি খুঁজতে বেরোই।

ইরা। [বিশ্বেশ্বরের গলা জড়িয়ে ধরে] তুমি কি বলছ বাবা! আমায় বকো, গালাগালি করো, ধরে মারো। আমি চুরি যে করতে এসেছিলাম—আমায় শাস্তি দেবে না?

বিশ্বেশ্বর। [মেয়ের মাথায় হাত রেখে]—শাস্তি, শাস্তি তো আমার পাওনা। মিথ্যে দম্ভ আমার। আরে কত দেশের কত ইতিহাস গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বেমালুম হল—আমি কোন ছার! আমি যাচ্ছি কিনা ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে মিনার গড়তে! কিছু হবে না। শুধু ধুলো মাথাই সার।

ইরা। [কাঁদতে কাঁদতে] তুমি যে কত বড়—তা কেউ বুঝল না, তোমার কাজের কেউ দাম দিল না। ঘরে-বাইরে তোমার এত লাঞ্ছনা আমি যে আর সইতে পারছি নে বাবা।

বিশ্বেশ্বর। তোর কত গুণ তা-ও কি কেউ বুঝল? আরে, আমার

যত অপরাধই হোক, তোর গুণেই যে তোকে ঘরে নিয়ে যাওয়া উচিত—

ইরা। আমরা গরিব বলে মানুষে এত হেনস্তা করে। পণ নিয়ে কষাকষি করে।

বিশ্বেশ্বর। পণ? না না, অম্বুজ ডাক্তারের সঙ্গে পণের কথা কিছু হয় নি। বিনা পণেই ওখানে বিয়ে হয়ে যেত। গোলমাল বাধল কাশীশ্বরের ব্যাপার নিয়ে।

ইরা। ঐ তো পণ বাবা। তোমার এতদিনের সাধনার সমস্ত ফলাফল তোমার কাছে চেয়ে বসল। কোন্ ছেলের বাপ এর চেয়ে কবে বড় পণের দাবি করেছে?

বিশ্বেশ্বর। ভেবে দেখলাম মা, গরিব লোকের পক্ষে এসব বই লেখা মানায় না। আমি আবার চাকরি-বাকরির চেষ্টা করব। পরজন্মে যদি ভাল ঘরে জন্মাই, তখন ইতিহাস নিয়ে কাজ করব। এ জন্মে ইতি।

ইরা। শোও, শুয়ে পড় বাবা। দরজায় খিল দিয়ে শোও। চোর যাতে আর ঢুকে পড়তে না পারে।

ইরা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। বিশ্বেশ্বর ক্ষণকাল বসে রইলেন। তারপর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ক্ষণ পরে এক বিশাল পুরুষের ছায়া ভেসে উঠল দেয়ালে। বিশ্বেশ্বর ঘুমে অচৈতন্য। স্বপ্নে দেখছেন সেই ছায়ামূর্তি যেন বলছে—

রামনিধির ছায়ামূর্তি। আমি রামনিধি। তুমি পৌত্র বলে নয়—ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বরের কাছে আমি দাবি করছি। গলায় দড়ি বেঁধে দম আটকে নৃশংস ভাবে আমায় মারল। কাশীশ্বরকে টাকা দিয়ে নীলকরেরা কিনে ফেলেছিল। সকল মানুষের চোখে সে ধুলো দিয়ে গেছে। শুধু তোমার কাছেই সে ধরা পড়ল। ন্যায়ের দণ্ড তোমার

হাতে ঐতিহাসিক। আমি বিচার চাই। সর্বকালের মানুষের সামনে কাঠগড়ায় তুলে বিশ্বাসঘাতক কাশীশ্বরের তুমি বিচার কর—

বিশ্বেশ্বর বিছানায় উঠে বসলেন। ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হল।

বিশ্বেশ্বর। আমি গরিব, কন্যাদায় আমার। ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি। ইরা মা বড় ভাল—অরুণও ভাল ছেলে। দু'টিতে সুখে থাকবে। সেই লোভে মেয়ে আজ কাগজ চুরি করতে আমার ঘরে ঢুকেছিল। মেয়ের সাধ-বাসনা আমি পায়ে থেঁতলে দিই কেমন করে?

বিশ্বেশ্বর ক্লান্ত ভাবে শুয়ে পড়লেন। অনতিপরেই অপর দেয়ালে হাত জোড় করে আর একটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। বিশ্বেশ্বর আবার ধড়মড় করে ওঠেন—

বিশ্বেশ্বর। কে?—কে?

কাশীশ্বরের ছায়ামূর্তি। আমি কাশীশ্বর।

বিশ্বেশ্বর। কাশীশ্বর রায়? আমার কাছে কেন?

কাশীশ্বরের ছায়ামূর্তি। তুমিই আমায় এত বড় করেছ। আকাশে তুলে ধরে পাঁকের মধ্যে আর আমায় ছুঁড়ে দিও না—আমায় মার্জনা কর। বিশ্বাস ঘাতকতার অনেক শাস্তি হয়েছে আমার। লাঠি মেরে মাথা ভেঙে চাঁদপালঘাটের পাশে চরের উপর আমাকে ফেলে দিল। শেয়ালে আমার দেহ নিয়ে সারা রাত ছেঁড়াছিঁড়ি করল। সকাল হলে শকুনের দল আমায় ঘিরে ধরল। অনেক তো হয়ে গেছে। শাশ্বত কালের দরবারে আমায় দাঁড় করিও না।

ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হল।

বিশ্বেশ্বর। বড় দরদ দিয়ে লিখেছিলাম তোমার অধ্যায়টা—বড় দরদ দিয়ে লিখেছিলাম। এ যে আমার নিজেরই উপর ছুরি বসানো, সে কি আমি জানি নে?

বিশ্বেশ্বর আবার শুয়ে পড়েন। পাখির ডাকের সঙ্গে ক্রমশ ভোরের আলো দেখা যায়। বেলা বাড়ে। সদ্যস্নাতা ইরা বাপের জন্য চা নিয়ে আসে। বিশ্বেশ্বর তখনও নিদ্রিত। ইরা ডাকে—

ইরা। বাবা! বাবা, ওঠ। বড্ড বেলা হয়ে গেল যে—

বিশ্বেশ্বর উঠে বসলেন।

বিশ্বেশ্বর। ও কী দুঃস্বপ্নেই যে সারারাত কেটেছে মা!

অরুণ প্রবেশ করল।

এসেছ অরুণ? ভাল হয়েছে! তোমার কথাই ভাবছিলাম। না এলে খুঁজে খুঁজে যেতাম তোমাদের বাড়ি।

ফাইলটা তুলে নিয়ে—

নাও, এইগুলো নিয়ে পালিয়ে যাও। শিগগির পালাও। বড্ড লোভের জিনিস। বলা যায় না, আবার হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেব।

অরুণ। কি এসব?

বিশ্বেশ্বর। সেই যে গন্ধমাদন নিয়ে এসেছিলাম, ঝাড়াই-বাছাই করে এই দাঁড়িয়েছে। বাকি সব ভুষিমাল। তোমাদের বাড়ি থেকে এনেছিলাম—আবার তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। পালাও, পালাও, পালিয়ে যাও—

অরুণ। পরিশিষ্ট তাহলে আর লিখবেন না?

বিশ্বেশ্বর। না, এ জন্মে আর লিখব না। কাছে থাকলে হয়তো লিখবার লোভ হবে। তার ওপরে কৃতান্ত বড় জ্বালাতন করছে। তাগাদায় তাগাদায় আমাকে অস্থির করে তুলছে।

অরুণ। বলে দিন, এসব নিয়ে আমি কি করব?

বিশ্বেশ্বর। আমি কী জানি, আমি কী বলব। তুমি ইতিহাস ভালবাস, সেই টানেই এসে পড়েছিলে এ বাড়িতে। কত পড়াশুনো তোমার। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ চিরকাল কেরানিগিরি করে এসেছি। এ কাগজ নিয়ে কি করতে হবে আমি কি বলে দেব? এতদিন ধরে জড়ো-করা কাগজের বোঝার কি গতি হবে, ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ইরাকে বলছিলাম, তুই পুড়িয়ে ফেল। শুধু এই

ক-খানা নয়, আস্তে আস্তে ঘরের সমস্ত বোঝা খালি করে তুমি নিয়ে যেও। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, এক লহমা ঘুমোতে পারি নে। ঘর সাফ করে আমায় মুক্তি দাও অরুণ, আমায় মুক্তি দাও—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের বাড়ির বারান্দা। রাত্রি প্রায় ন'টা। সরমা ও বিশ্বেশ্বর বসে আছেন।

সরমা। কাজ যখন নেই, মিছে রাত করে কি হবে? ইরা এলেই খেতে বসবে। কতদিন তুমি রান্নাঘরে খাওনি!

ইরা এলো।

বিশ্বেশ্বর। ইরা এলি? হাতে-মুখে জল দিয়ে নে। আজ একসঙ্গে সকলে খেতে বসব।

ইরা। তোমরা কিন্তু রাগ করতে পারবে না মা। সব টিউশানি ছেড়ে দিয়ে এলাম। এক ছাত্রীর এক্জামিন হয়ে গেছে; সেটা এমনিতেই গেল। আর এক জায়গায় জবাব দিয়ে এলাম।

সরমা। বেশ করেছিস। আর দু'দিন বাদে টিউশানি তো ছেড়ে দিতেই হত—

ইরা। ছেড়ে দিতে হত? কেন?

সরমা। আহা-হা, জানেন না যেন কিছু! চল্, খেতে চল্।

ইরা। না। আগে তুমি বল, কেন ছেড়ে দিতে হত। তবে যাব।

সরমা। আর দু'দিন বাদে তুই তো নিজের বাড়িতে চলে যাবি। তাই বলছিলাম, টিউশানিগুলো ছেড়ে ভালই করেছিস।

ইরা। সেই ভাল মা। আমি একা নই—চল, আমরা সবসুদ্ধ নিজেদের ঘরবাড়িতে চলে যাই।

সরমা। মানে?

ইরা। মণিরামপুর চলে যাব। পঞ্চানন-দাকে বলেকয়ে আজ মণিরামপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিশ্বেশ্বর। পঞ্চানন মণিরামপুরে গিয়ে কি করবে?

ইরা। গ্রামের লোকে তাঁর কাছে ভরসা দিয়েছে, তিনি ব্যবস্থা করে আসবেন।

সরমা। কলকাতা ছেড়ে তবে কি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকবি?

ইরা। পাড়াগাঁয়ের মতলব তো তোমারই মা। পঞ্চানন-দাকে খোঁজখবর আনতে তুমিই বলেছিলে।

সরমা। গাঁয়ে যদি যেতেই হয়, বিয়েথাওয়া চুকে যাক—তারপর না হয় যাওয়া যাবে। এত তাড়াহুড়োর কি আছে?

ইরা। তাড়া আছে বৈ কি মা! সাধ্য হলে এখুনি ছুটে যেতাম। বাড়িওয়ালার মুখে শুনলাম, অম্বুজাক্ষ ডাক্তার এ বাড়ি কিনে নিচ্ছেন।

সরমা। তাই নাকি?

ইরা। হ্যাঁ। আজ—এখনো পর্যন্ত এটা আমাদের ভাড়া-বাড়ি। ভাড়া দিই—না দিতে পারলে, বাড়িওয়ালার কথা শুনি। তাতে ইজ্জত আছে। এঁদোগলির এই ভাঙা বাড়ি ওরা কিনে নিচ্ছে, সেটা ভাড়ার টাকার জন্যে নয়। সেই সঙ্গে ওরা আমাদেরও কিনে নেবার মতলব করেছে।

সরমা। ও কী কথা ইরা! অরুণ আসা-যাওয়া করে। আমাদের অসুবিধা চোখে দেখেছে। তাই হয়তো—

ইরা। তাই হয়তো বাড়ি কিনে নিয়ে আমাদের বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে। এই তো মা? কিন্তু রামানিধির বংশের মানুষ দয়ার দান হাত পেতে নেয় না। বিশেষ করে টাকার লোভে যাদের পূর্ব-পুরুষ রামনিধিকে ফাঁসিতে লটকেছিল—

প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। ভেবে দেখছি, ইরা বাজে কথা বলেনি বড়বো। ইতিহাসের কাজকর্ম যখন ছেড়েই দিয়েছি, দরকার কি আর এখানে পড়ে থেকে? মণিরামপুরের লোকেরা আদর করে ডেকেছে—চল, সেখানে যাওয়া যাক। পাড়াগাঁ জায়গা, চলে যাবে কোন রকমে?

সরমা। কিন্তু ওর যে বিয়ে! কাগজপত্তোর ফিরে পেয়ে অম্বুজ ডাক্তার বড্ড খুশি। পাকাদেখার দিন করে খবর পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর। বিয়েথাওয়া তো পাড়াগাঁয়েও হয় বড়বৌ।

সরমা। কিন্তু মেয়ে নিয়ে চুপি চুপি গাঁয়ে সরে যাবে বলেই কি অম্বুজ ডাক্তারের ইচ্ছে মতো কাগজপত্তোর সব দিয়ে দিলে?

বিশ্বেশ্বর। আমার কাজ আমি করলাম বড়বৌ। পাত্রপক্ষের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিলাম। এবার যা-কিছু ওদেরই করবার কথা।

ইরা পুনরায় প্রবেশ করে বলে—

ইরা। বাব্বা! এখনো গল্প করছ মা? চল, খেতে দেবে চল। গল্প করতে বসলে তোমার যদি কিছু মনে থাকে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি। চল বড়বৌ—

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৃতান্ত বিশ্বাসের বাড়ি। যুগচক্রের প্রুফ-রিডার প্রকাশ প্রুফের তাড়া পাশে ফেলে রেখে একটা লেখা পড়ছিল। এমন সময় কৃতান্ত প্রবেশ করে বলে—

কৃতান্ত। প্রুফ ফেলে রেখে এটা কি হচ্ছে?

প্রকাশ। [অন্যমনস্ক ভাবে] লেখা।

কৃতান্ত। লেখা কি ?

প্রকাশ। [মুখ না তুলে] ছাপা হবে না, সরে পড়ুন মশাই। সরে পড়ুন—

কৃতান্ত। কাকে কি বলছ, খেয়াল থাকে না ?

প্রকাশ। [কাগজ থেকে মুখ তুলে] ও, আপনি! এই লেখাটার কথা বলছি। বেড়ে লেখা !

কৃতান্ত। লেখার বিচার সম্পাদকের, তোমার নয়। প্রুফ দেখ চুপচাপ।

চেয়ারে বসে লেখাটা টেনে নিল। প্রকাশ প্রুফের তাড়া খুলে দেখতে বসে। কৃতান্ত একটা সিগারেট ধরায়। লেখা পড়তে পড়তে সে বলে—

হুঁ, জোরালো লেখা! লেখকের নামটা হল বিষকুম্ভ। বিষকুম্ভ কি ? ঘোষ, বোস, চাটুজ্জে, বাড়ুজ্জে যা-হোক একটা উপাধি থাকবে তো!

প্রকাশ। উপাধি নেই।

কৃতান্ত। [কাগজটা উলটে-পালটে দেখে] লেখকের ঠিকানাও তো দেয় নি—

প্রকাশ। আজ্ঞে, ডাকে এসেছে।

কৃতান্ত। ও। আচ্ছা যাও—বেলা সাড়ে-দশটা বাজতে চলল, প্রেসে চলে যাও।

প্রকাশ প্রুফের তাড়া নিয়ে চলে গেল। লেখাটা পড়তে পড়তে খুশিতে কৃতান্তর মুখ ভরে গেল। সহসা চিৎকার করে ডাকে—

ওগো, শুনছ ? শিগগির এক কাপ চা—

পড়তে থাকে। আরও কয়েক পাতা উলটে পুনরায় ডাকে—

ওগো, চায়ের কি হল ?

হাতা-হাতে ভবতারিণী প্রবেশ করে। রান্না ফেলে তাকে চলে আসতে হয়েছে।

ভব। হবে আবার কি! চা হয় নি। সকাল থেকে পঞ্চাশ বার কেবল চা আর চা। নেপলা-গোপলা ইস্কুলে যাবে, তাদের ভাতের যোগাড় করব—না, সকাল থেকে পঞ্চাশ বার চা করব?

কৃতান্ত। চা-ই করবে। নেপলা-গোপলার ইস্কুলে যাওয়ার চেয়ে আমার জন্য চা তৈরি বেশি important।

ভব। আহা, কি কথাই বললে! ছেলেরা পড়াশুনো করবে না, ইস্কুলে যাবে না—আর উনি বাড়ি বসে বসে শুধু চায়ের হুকুম ঝাড়বেন। ছেলে দুটো যদি মানুষ হয়, তবেই আখের। নইলে তোমার হাতে পড়ে তো খুব সুখই হল।

কৃতান্ত। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আর্টিকেলটা শেষ করতে দাও। এটা ছাপতে পারলে, জেনে রেখো, ইলেকশনের মওকায় সব দুঃখু তোমার ঘুচে যাবে।

ভব। রাখ তোমার ইলেকশন। স্বাধীন হওয়ার পর দু-দুটো ইলেকশন হয়ে গেল। তাছাড়া কর্পোরেশনেরও হল গোটা কতক। দুঃখ তো আমার খুব ঘুচল! এইরেঃ, সেরেছে! ধরা গন্ধ বেরিয়েছে। ডালটা বুঝি ধরে গেল। নাঃ, পারিনে আর সব দিক সামলাতে।

বেগে প্রস্থান।

কৃতান্ত। ভারি তো কাজ করছেন, তার আবার পারিনে! যে রাঁধে, সে যেন আর আর চুল বাঁধে না!

পঞ্চানন প্রবেশ করল। তাকে দেখে কৃতান্ত জিজ্ঞাসা করে—

এই যে পঞ্চানন! মণিরামপুর থেকে কবে ফিরলে?

পঞ্চানন। কাল রাত্রে।

কৃতান্ত। তা বিশ্বেশ্বর-দা গাঁয়ে গিয়ে সপরিবারে উঠলেন কোথায়?

পঞ্চানন। কেন? নিজের বাড়িতে।

কৃতান্ত। বাড়ি মানে তো পোড়ো-ভিটে, আর এক তেঁতুলগাছ।

পঞ্চানন। ভিটের ওপর সতীশ মোড়ল নতুন চৌরিঘর তুলে দিয়েছে। গাঁয়ের লোকে ওঁদের জন্যে খুব করছে। গাঁয়ের মালিক হলেন অম্বুজ ডাক্তার। তাঁর হুকুমে সহদেব গোমস্তা যখন যা দরকার, ছুটোছুটি করে এনে দিচ্ছে।

কৃতান্ত। অম্বুজ ডাক্তারের তা হলে কৃতজ্ঞতা আছে বলতে হবে। মৃত্যুবাণটা দাদা ওর ছেলের হাতেই ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু মেয়েটাকে এখনও নিচ্ছে না কেন?

পঞ্চানন। মেয়েটা তো আর গরুর গাড়ি নয় যে টান দিলেই গড়-গড় করে চলল। তার জেদেই তো গ্রামে যাওয়া। তা যাক, এদিকে আমাদের খবর কি বলুন?

কৃতান্ত। অতিশয় শুভ। কিছুক্ষণ আগেও ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না—বিশ্বেশ্বর-দা কাগজপত্র দান করে মণিরামপুরে বনবাসী হলেন, তাহলে যুগচক্রের উপায়টা কি? তা দেখ, ভগবান আকাশ থেকে ছুঁড়ে দিলেন। বিশ্বেশ্বর গেলেন তো এলেন বিষকুম্ভ! পড়ে দেখ।

> কৃতান্ত পঞ্চাননের দিকে প্রবন্ধটা এগিয়ে দিল। পঞ্চানন লেখাটা পড়তে লাগল। কৃতান্ত ভেতরের দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিল—

ওগো শুনছ? নেপলা-গোপলা ইস্কুলে গেল?

ভবতারিণী ঘরে ঢুকে দেখলেন পঞ্চানন এসেছে। শশব্যস্তে মাথায় কাপড় তুলে দিলেন; শান্তকণ্ঠে স্বামীকে বললেন—

ভব। ডাকছ কেন?

কৃতান্ত। ডাকিনি তো। জিজ্ঞেস করছিলাম নেপলা-গোপলার কি খাওয়া হল?

ভব। না, ওরা এই খেতে বসল।

কৃতান্ত। [চোখ কপালে তুলে] কিন্তু আমার গলা যে এদিকে শুকিয়ে কাঠ।

ভব। তোমার গলায় আর রস কখন? সব সময়েই তো কাঠ হয়ে আছে।

কৃতান্ত। থাকবেই তো! ছেলেপিলের কাণ্ডকারখানা দেখে গলা শুকানো কি বলছ—হাত-পা ঠাণ্ডা হবার যোগাড় হয়েছে। এতক্ষণে খেতে বসল! ইস্কুলের ঘণ্টা বাজতে আর পনের মিনিট দেরি। ওঁরা যখন খেয়ে উঠবেন, তখন তো ইস্কুলের ছুটি হয়ে যাবে। নাঃ, হারামজাদাদের কিছু হবে না। সব অপব্যয় হচ্ছে।

ভব। বলি, অপব্যয় আর কোনটা নয় তোমার? ছাপাখানা থেকে গাদা গাদা কাজ ছাপানো আর এই যত লেখাপড়া—সবটাই তো অপব্যয়।

পঞ্চানন। [কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলে] ও কথা বলবেন না বৌদি। এখন তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে ওগুলো দেশের লোকের কাছে—

ভব। তুমি আর দেশ দেশ কোরো না ঠাকুরপো। বিয়ে হয়ে পর্যন্ত শুনছি—দেশের ভাবনা, দেশের কথা, দেশের কাজ। বলি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে তবে তো দেশের কথা ভাবব! 'ভেতরে ঠন-ঠন বাইরে লণ্ঠন'—গা জ্বলে যায়!

ভবতারিণী চলে গেল। পঞ্চানন হাসতে থাকে। কৃতান্ত বলে—

কৃতান্ত। শুনলে পঞ্চানন, তোমার বৌদির কথাগুলো? আমাদের মতো intellectual personদের পক্ষে এরকম স্ত্রী curse ছাড়া আর কি বলব?

পঞ্চানন। ও কথা বলবেন না দাদা। ভার্যা বিদুষী হলে, এই

কষ্টের সংসারে তিনি আর হাঁড়ি ঠেলতেন না। এতদিনে তিনি হয়তো divorce-এর মামলা রুজু করে বসতেন।

ভবতারিণী চা নিয়ে আসে। এক কাপ পঞ্চাননের হাতে দিল। অপর কাপ কৃতান্তর সামনে ধরে বলে—

ভব। চা।

কৃতান্ত। Don't disturb—

ভব। মরণ! চা নিয়ে এসেছি যে!

কৃতান্ত। ও! ভব? ভবতারিণী? তা, চা রেখে যাও।

ভবতারিণী বিরক্তভাবে চা দিয়ে চলে গেল। কৃতান্ত অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চায়ের কাপে ছাই ঝাড়ে। পঞ্চানন বলে—

পঞ্চানন। করছেন কি? ওটা যে চা।

কৃতান্ত। ওই দেখ, মাথায় প্লান ঘুরতে থাকলে কেমন সব গুলিয়ে যায়।

পঞ্চানন প্রবন্ধ পড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে পা নাচাতে নাচাতে চায়ের কাপ মনে করে সে ছাইদানিটা মুখে তোলে। পঞ্চানন বলে—

পঞ্চানন। ওটা ash-tray—

কৃতান্ত। তাই তো!

পুনরায় চায়ের কাপ মুখে তুলে থু-থু করতে থাকে।

পঞ্চানন। [হেসে] দাদা, বিষকুম্ভের লেখাটা পেয়ে সত্যি আপনার মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কৃতান্ত। হবে না? লেখা নয় পঞ্চানন, আসলে ওটা কল্পতরু। এই ইলেকশনের মুখে নাড়া দাও—ঝুরঝুর করে টাকা পড়বে।

পঞ্চানন। আমি ভাবছি, এত খবর লোকটা পেল কোথায়?

কৃতান্ত। ভগবান যুগিয়েছেন। ভগবানে বিশ্বাস রাখ পঞ্চানন। লেখাটা এখুনি প্রেসে দিয়ে দাও। সামনের সংখ্যায় বেরিয়ে যাক।

পঞ্চানন। বেশি করে ছাপতে হবে দাদা। একহাজার—

কৃতান্ত। উঁহু, পাঁচহাজার—

পঞ্চানন। তবে দশহাজার—

কৃতান্ত। Matter standing রেখে দিতে বল। বিশহাজারেও উঠতে পারে। ইলেকশনের হাওয়া কখন কোন দিকে বয়, কিছুই বলা যায় না।

তৃতীয় দৃশ্য

মণিরামপুরে বিশ্বেশ্বর সরকারের বাড়ি। আটচালা, সামনে প্রশস্ত উঠান। পাশে রাঁধবার জায়গা। ঘরের সংলগ্ন দাওয়া। দাওয়ায় মাদুর বিছানো, একপাশে জলচৌকি, গাড়ু ও গামছা। এক বৈষ্ণবী গান গাইতে গাইতে উঠানে প্রবেশ করে। সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে ভিক্ষা দিলেন। বৈষ্ণবী ভিক্ষা নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। সরমা পুনরায় ঘরে প্রবেশ করেন।

[বৈষ্ণবীর গান]

মন আমার, ভুল করে তুই বিকালি মন
ভুলের হাটে
আহা কৃষ্ণ বিনা কেমন করে দিন কাটে॥
ও তুই কুড়াস কাঁটা অভিমানের
অনুরাগের ফুল ভুলে
রাধে গোকুলে তোর ঠাঁই না হলে
ঠাঁই পাবি বল্ কোন্ কূলে।
আহা পথ চিনে তুই পথ হারালি
চির-চেনা ব্রজের হাটে॥

ভুলেছিস হৃদয়-চোরা
বৃন্দাবনের মন-ভ্রমরা
এবার ভুলের মাশুল বুকের আগুন
তুই নয়নের অঝোরঝোরা।
রাধে চোরের ঘরে করতে চুরি
হারিয়ে এলি মনটারে
এবার চোরের সাথে চুপিসাড়ে
দে মিলিয়ে জীবনটারে।
ও তুই লোকের কথায় কান না দিয়ে
চোরকে বসা হৃদয়-পাটে ॥

উঠানের বেড়া ঠেলে সতীশ মোড়লের সঙ্গে ইরা প্রবেশ করে।

ইরা। বুঝলে সতীশদা, কলকাতা থেকে এসে দিন আর কাটতে চাইছে না। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন দুষ্টুমি করে বেড়ায়। ভাবছি, তোমার চণ্ডীমণ্ডপটায় ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে একটা ইস্কুল বসাব—

সতীশ। বেশ তো, বসাও না ইস্কুল। গাঁসুদ্ধ ছেলেমেয়ে ঝেঁটিয়ে তুলে এনে দেব তোমার ইস্কুলে। গাঁয়ে তো বড়লোক কতই আছে। এমন সব কাজের মতলব কারুর মাথায় আসে না। মাঠ থেকে ফিরে এসে তোমার ইস্কুলের জন্য আজ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরব। এখন চললাম দিদিমণি।

সতীশ চলে গেল। বিশ্বেশ্বর ছাতা বগলে ঘর থেকে বেরুলেন। এমন সময় অন্য দিক থেকে সহদেব তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। সহদেবের হাতে একখানা যুগচক্র।

সহদেব। এই যে, সরকার মশায় বেরুচ্ছেন দেখছি। ঠিক সময়ে এসে পড়েছি যা হোক। ডাক্তারবাবু চিঠি দিয়েছেন। আপনার

এই ভিটেয় একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় হবে। কাজেই আপনাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। উঠে যেতে হবে?

সহদেব। হ্যাঁ। এ সম্পত্তি নিলেমে কিনে বয়নামা জারি করে আইনমতো বাঁশদখল করা আছে আমাদের। সতীশ গোঁয়ার্তুমি করে রাতারাতি দু-খানা ছাবড়া তুলে দিয়েছে বৈ তো নয়!

ইরা। তাহলে আপনি বলতে চান, এ জমি আমাদের নয়?

সহদেব। না। দয়া করে ডাক্তারবাবু তোমাদের এখানে থাকতে দিয়েছিলেন। আমি আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিলাম। চিঠির উত্তরে ডাক্তারবাবু জানালেন—থাক, পণ্ডিত মানুষ দেশে-ঘরে গিয়ে যখন উঠেছেন, তখন আর তাঁকে উত্যক্ত কোরো না। বরং তাঁর যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখ।

ইরা। তা এর মধ্যে কী এমন আমরা অন্যায় করলাম, যার জন্যে রাতারাতি আমাদের তুলে দিয়ে এখানে হাসপাতাল করার মতলব হল?

সহদেব। কারণ ঘটেছে কিছু। আমরা হচ্ছি, ভালর ভাল মন্দের মন্দ। [যুগচক্র কাগজখানা মুখের কাছে তুলে ধরে] আমাদের মন্দ করলে আমরাও ছেড়ে কথা কইব না। সহজে না উঠলে আমরা কিন্তু আপনার নামে মামলা করব সরকার মশাই। আপনার মতো মানুষকে জমি জবরদখল করার জন্যে ফৌজদারি আসামি হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জোর করে উচ্ছেদ করার জন্যে দাদাবাবু শিখ-সৈন্য আর টোটার বন্দুক আনবেন। তার চেয়ে আপোষে ছেড়ে দিয়ে যান। ঘর দু-খানার যা হোক কিছু মূল্য ধরে দেওয়া যাবে।

সহদেবের কথার মাঝে সরমা দাওয়ায় এসে দাঁড়ান।

বিশ্বেশ্বর। [ইরার দিকে চেয়ে] কী মুশকিল দেখ তো মা! কী সব মামলা-মোকর্দমার কথা বলছেন।

ইরা। আপনার হাতে ওটা কি গোমস্তা মশাই? মোকর্দমার সমন, না ডাক্তারবাবুর চিঠি?

সহদেব। তোমরা বিবাদী পক্ষ, তোমাদের চিঠি দেখাব কেন? আর সমনের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। আদালতের পেয়াদা এসে ঠিক সময় দিয়ে যাবে। হাতের এ জিনিসটা তোমাদেরই দিয়ে যাব বলে এনেছি। নিন সরকার মশাই, পড়ে দেখুন।

সহদেব কাগজটা বিশ্বেশ্বরের হাতে দেন। বিশ্বেশ্বর দেখে বললেন—

বিশ্বেশ্বর। একি! এ যে যুগচক্র!

ব্যস্তভাবে পাতা উল্টে যাচ্ছেন।

একি! কাশীশ্বর সম্বন্ধে নতুন প্রবন্ধ—

প্রবন্ধটার উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে ইরার হাতেদিয়ে বলেন—

পড়ে দেখ্ মা। সত্যিই খেটে লিখেছে।

সহদেব। লিখেছেন তো আপনি মশাই।

বিশ্বেশ্বর। লিখবার বড্ড ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল কৈ? গরিব বলেই হল না। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে।

সহদেব। জানেন না? কে লিখেছে তবে? যে সে লোকের কলমে এ সমস্ত লেখা বেরোয় না। ডাক্তারবাবুও চিঠিতে তাই লিখেছেন।

বিশ্বেশ্বর। আমি লিখিনি। আমি কিছু জানিনে, শুধু শুধু আমার বদনাম দিচ্ছেন। কালীতলায় গিয়ে বলে আসতে পারি।

ইরা। দেখুন, এ সম্বন্ধে বাবা কিছু জানেন না। আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন।

সহদেব। কি ?. যা খুশি ?

ইরা। হ্যাঁ। যা খুশি তাই করতে পারেন।

সহদেব। বেশ! তাই হবে। যা খুশি তাই করব।

প্রস্থান। সরমা দাওয়া থেকে নেমে এলেন।

সরমা। ছাইপাঁশ আবার কি লিখেছ তুমি ?

ইরা। বাবা লেখেন নি।

সরমা। সহদেব গোমস্তা তা হলে চোখ রাঙিয়ে নাহক কতকগুলো কথা বলে গেল কেন ?

ইরা। বলা মুখ আর চলা পথ কেউ কি বন্ধ করতে পারে মা ?

সরমা। তা তো পারে না। কিন্তু এই ছাপা কাগজটা তো আর মিথ্যে নয়—

বিশ্বেশ্বর। যে দিব্যি করতে বল বড়বৌ, তাই করছি। ও লেখা আমার নয়, আমি কিছু জানিনে। ইতিহাস কি বস্তু, তুমি তো জান বড়বৌ! এক লাইন লিখতে গেলে এক বস্তা কাগজ ঘাঁটতে হয়। কি আছে আমার এখানে ? আমি তো একেবারে নিঃস্ব।

ইরা। ডাকাতরা সর্বস্ব নিয়ে গিয়ে এখন আবার বাবার ঘাড়ে দোষ চাপাতে আসে। লজ্জাও করে না!

ইরার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেড়ার দরজা ঠেলে উঠানে প্রবেশ করেন। অপরিচিত মানুষ দেখে সরমা ও ইরা ঘরে চলে যায়। ভদ্রলোকের নাম গোবিন্দভূষণ ঘোষ। সপ্রতিভভাবেই গোবিন্দভূষণ বিশ্বেশ্বরকে বলেন—

গোবিন্দ। এই যে সরকার মশাই। নমস্কার!

বিশ্বেশ্বর। নমস্কার!

গোবিন্দ। [হেসে] হেঁ-হেঁ-হেঁ, অচেনা মানুষটিকে দেখে

অবাক হচ্ছেন ? তা অবাক হওয়ারই কথা। বসুন। দিচ্ছি, পরিচয় দিচ্ছি সরকার মশাই।

গোবিন্দ ও বিশ্বেশ্বর দাওয়ায় বসলেন।

আমার নাম গোবিন্দভূষণ ঘোষ। আমি অরুণাক্ষর দাদামশাই—অরুণাক্ষর মা-ই আমার একমাত্র কন্যা। ডাক্তার অম্বুজাক্ষ রায় আমার জামাতা।

বিশ্বেশ্বর। ও বেশ, বেশ ! বড় খুশি হলাম আপনার পরিচয় পেয়ে—

গোবিন্দ। কিন্তু আপনি খুশি হলেই তো হবে না ! আমাকেও খুশি করতে হবে আপনার। পথে সহদেবের সঙ্গে দেখা। সে তো কিছুতেই আপনার কাছে আসতে দেয় না। বলে, অনেক গোলমাল—ওখানে আপনার যাওয়া চলতে পারে না। আরে বাপু, সদরে ওকালতি করেছি তিরিশ বছরের ওপর। দুঁদে উকিল বলে একটু নামডাকও ছিল। এখন সহদেব কিনা আমায় গোলমালের ভয় দেখাতে আসে !

বিশ্বেশ্বর। আপনি বিশ্বাস করুন। আমি কিছু জানি নে। ওঁরাই শুধু শুধু গোলমালের সৃষ্টি করছেন।

গোবিন্দ। করুক না—আমি আছি আপনার পক্ষে। দেখি, কে কি করে ? কৈ গো, কোথায় গেলে দিদি-ভাই ! ঘরে ঢুকে মুখ লুকিয়ে বসে রইলে কেন ? তোমায় দেখব বলেই যে এলাম !

বিশ্বেশ্বর। কোথায় গেলি ইরা ? ডাকছেন, এদিকে আয় না !

ইরা ধীরে ধীরে এসে গোবিন্দকে প্রণাম করে। গোবিন্দ হাত ধরে কাছে বসিয়ে বললেন—

গোবিন্দ। বোসো ! তোমার সঙ্গে চেনা-পরিচয় না থাকলে কি

হবে? ভেতরে ভেতরে তোমার সব খবর আমি জেনে বসে আছি।
এ-ও জানি, তুমি নাকি খুব ঝগড়া করতে পার।

ইরা লজ্জায় মাটির দিকে চেয়ে থাকে। গোবিন্দ বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে বলেন—

যাক, শুনুন। যে জন্যে এসেছি। আমার মেয়ে সুহাস অর্থাৎ অরুণের মা আমায় জানিয়েছিল যে, আপনার মেয়ের সঙ্গে অরুণের বিয়ের সব ঠিকঠাক। কিন্তু পাকা দেখতে গিয়ে কি যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। পরের চিঠিতে লিখল, আপনারা দেশে চলে এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ। হঠাৎ কি-রকম সব গোলমাল হয়ে গেল—বাধ্য হয়ে তাই দেশে চলে আসতে হল।

গোবিন্দ। যা হয়েছে, হয়েছে। এখন আপনার মেয়েটিকে নাতবৌ না করে তো স্বস্তি পাচ্ছি না। দু-এক দিনের মধ্যেই দিন-ক্ষণ দেখে সব পাকাপাকি করে ফেলতে চাই। এতে কিন্তু আপনি আপত্তি করতে পারবেন না। [ইরার প্রতি] শোন নাতবৌ, তোমায় একটা কথা বলে যাই। অরুণের সঙ্গে বনিবনাও না হলে সটান আমার বাড়ি গিয়ে উঠবে। তোমার দিদিমা বুড়ো অথর্ব মানুষ—সতীন পেলে খুশিই হবেন।…তা হলে আজ উঠি সরকার মশাই। পাকা-কথা হয়ে রইল কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হয়ে রইল বৈ কি!

গোবিন্দ। আচ্ছা, আজ চলি দিদি।

সরমা দরজার আড়ালে থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। ঘোমটা টেনে বাইরে এসে তিনি বলেন—

সরমা। উঠবেন না, একটু দেরি করে যেতে হবে।

গোবিন্দ। (হেসে) ওহো—বুঝেছি। শুধু-মুখে উঠতে দেবেন না। হবে হবে, সব পরে হবে। তোলা রইল। আজ আসি—

প্রস্থান। বিশ্বেশ্বর ও সরমা গোবিন্দের গমনপথের দিকে চেয়ে থাকেন।

চতুর্থ দৃশ্য

মণিরামপুর। ছোটখাট এক দোকান। সন্ধ্যা হয়েছে। সহদেবকে একটি টুলের উপর বসে তামাক খেতে দেখা যায়। পাশে চক্রবর্তী ও ভট্টাচায। তামাক টানতে টানতে সহদেব বলে—

সহদেব। বুঝলে ভটচায, শিখসৈন্য নিয়ে আসছেন বাবুরা। দাদাবাবু তিনটে টোটার বন্দুক সঙ্গে করে আনছেন। খবরটা দিয়ে দিও সতীশকে। সে যেন এবার বিশ্বেশ্বর সরকারকে ঠেকায়।

ভট্টাচার্য। বন্দুকের সামনে দাঁড়ানো কি যে-সে কথা! সতীশের মাতব্বরি এবার বোঝা যাবে। তিন তিনটে টোটার বন্দুক তো তিন-শ' লোকের সমান।

মুদি। তা আবার নয়! বন্দুকের কথা শুনে তো আমার বুক কাঁপছে। আসুন—

ভট্টাচার্যের দিকে হুঁকো এগিয়ে দেয়।

চক্রবর্তী। কাজটা কিন্তু ভাল করেন নি সরকারমশাই।

সহদেব। বুঝলে না, সতীশের উস্কানি আছে যে! ভাবলে, রাতারাতি জঙ্গল কেটে ঘর তুলে সরকার মশাইকে বসিয়েছি—তবে, আর কি! কাম ফতে! এখন বুঝুন ঠেলা।

চক্রবর্তী। চেপে যাও গোমস্তা মশাই, গোঁয়ারটা আসছে।

চক্রবর্তী। আসুক না, ভয় করি নাকি ওকে? বাবুর শ্বশুর গোবিন্দ ঘোষ মশাই সাতবেড়ে থেকে এসেছেন সরকার মশাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপোষরফা করতে। আমি তাঁকেও মানা করে দিয়েছি।

সতীশ কাছে এসে পড়েছে।

ভট্টাচার্য। ঐ যে সতীশ মোড়ল। ডাকব নাকি গোমস্তা মশাই?

সহদেব। ডাক না—

ভট্টাচার্য। ওহে, ও সতীশ মোড়ল! এদিকে এসো, এদিকে এসো [সতীশ এলো] বলি, গোমস্তা মশায়ের কাছে এ সব কি শুনছি? গাঁয়ের মধ্যে গুলিগোলা চলাটা কি ভাল? ঝগড়া মিটিয়ে নিতে বল সরকার মশাইকে।

সতীশ। মাথা নেই তার মাথাব্যথা! বলি, ঝগড়া থাকে তবে তো মেটামেটির কথা!

ভট্টাচার্য। ঝগড়া নেই মানে? সরকার মশাই ডাক্তারবাবুর নামে কাগজে কুচ্ছো ছেপেছিল যে—

সতীশ। সরকার মশাই ছাপেন নি।

ভট্টাচার্য। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে শিখসৈন্য আসছে, টোটার বন্দুক আসছে—

সতীশ। তাই নাকি? আনছে কে, সহদেব গোমস্তা? না, ডাক্তারবাবু নিজে?

সহদেব। আমি হুকুমের চাকর। যাঁদের আনার কথা তাঁরাই আনছেন।

সতীশ। তা আনুন না। কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক দেখে মানুষ আর ভয় পায় না। সে-যুগে লালমুখো নীলকর সাহেবদেরও বন্দুক ছিল। কিন্তু হল কি? শেষে দেশ থেকে পাততাড়ি গুটোতে হল না? বন্দুক চালালে ডাক্তারবাবুরও সেই অবস্থা হবে, মনে রেখ।

সহদেব। আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

সতীশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখে নিয়ো। হাটবাজারে বসে অনেকেই ও-রকম ফুটানি করে। আমার জানা আছে।

প্রস্থান।

সহদেব। দেখলে তো মেজাজটা! মরে তবু মর্যাদা হারায় না।

অরুণ একটা ছোট স্যুটকেশ হাতে সেখানে প্রবেশ করে। তাকে দেখে সহদেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে—

সহদেব। একি দাদাবাবু, আপনি? ছিঃ ছিঃ! একটা খবর পেলে লোকজন নিয়ে আমি ইস্টিসানে যেতাম। দেখুন দেখি, কী অন্যায়! দিন, ব্যাগটা দিন—

সহদেব অরুণের হাত থেকে ব্যাগ নিল।

চক্রবর্তী। ছোটবাবু? যা-হোক করে সরকার মশাইর সঙ্গে আপোষরফা করে ফেলুন। গাঁয়ে ঘরে সৈন্য ঢুকিয়ে গুলিগোলা চালান কি ভাল?

অরুণ। [হেসে] হ্যাঁ। তা তো বটেই। যা হোক একটা-কিছু করতে হবে বৈ কি! গোমস্তা মশাই, শিখসৈন্য সঙ্গে আনতে লিখেছিলেন বটে, কিন্তু ভেবে দেখলাম আমি একাই পারব। …দাদু এসেছেন?

সহদেব। আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন। আপনাদের বাড়িতেই আছেন।

অরুণ। আপনি বাড়ি যান। দাদুকে বলবেন, আমি সরকার মশায়ের ওখানে যাচ্ছি—

সহদেব। একা যাবেন? পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে নিয়ে আমিও না হয় আপনার সঙ্গে যাই।

অরুণ। আপনাকে যেতে হবে না। পাইক-বরকন্দাজেরও দরকার নেই।

অরুণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরের বাড়ির দাওয়া। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দাওয়ার উপরে একটি হেরিকেন জ্বলছে। বিশ্বেশ্বর খাতাপত্র লিখছেন। সরমা কুটনা কুটছেন। ইরা ঘরথেকে বেরিয়ে উঠানে নামে। সহসা কাকে দেখতে পেয়ে বলে—

ইরা। কে? কে ওখানে?

বিশ্বেশ্বর। কে?

অরুণাক্ষ এগিয়ে এসে সরমাকে প্রণাম করে।

সরমা। একি, অরুণ! কতক্ষণ বাবা?

অরুণ। এই কিছুক্ষণ হল। আপনারা ভাল আছেন?

সরমা। নানান ভয়-ভাবনায় কোন রকমে দিন কাটছে বাবা।

অরুণাক্ষ বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে।

বিশ্বেশ্বর। অরুণ? প্রথমটা ঠিক ঠাওর করতে পারিনি বাবা। বস, বস।

অরুণ বিশ্বেশ্বরের কাছে বসে। ইরা বলে—

ইরা। তা আপনি একা এলেন যে! সৈন্যসামন্ত আনেন নি?

অরুণ। [সবিস্ময়ে] সৈন্যসামন্ত!

ইরা। হ্যাঁ, আপনাদের গোমস্তা বলে বেড়াচ্ছে। শিখসৈন্য সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি হয়ে আসছেন আপনি। ঝগড়া-বচসা, দাঙ্গাহাঙ্গামা—এমন কি খুনোখুনি পর্যন্ত হবে।

অরুণ। হুঁ! যা কাণ্ড দেখছি, শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি হওয়া বিচিত্র নয়। মেজাজ ঠিক রাখা সত্যিই মুশকিল। তবে দাঙ্গা-

হাঙ্গামার আগে ঝগড়া করব আপনার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কিনা মেশোমশাইকে দিয়ে জমাখরচ নকল করাচ্ছেন!

কুটনা নিয়ে সরমা ঘরে চলে গেলেন।

ইরা। জমাখরচ নয়—ইনকামট্যাক্সের খাতা। হাটখোলার এক দোকানদার বাবাকে ঐ লেখার জন্যে মাসে পনের টাকা করে দেন। তেল-নুন আর হাটখরচটা কোন রকমে তাতে চলে যায়।

অরুণ। হ্যাঁ, সহদেবের চিঠিতে অবস্থার কিছু আঁচ পেয়েছিলাম বটে! কিন্তু ভাবি নি শালগ্রাম-শিলা দিয়ে বাটনা বাটা হচ্ছে। কাশীশ্বরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের অপরাধের আর অন্ত নেই। আচ্ছা, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয় বলতে পারেন? [ইরা নিরুত্তর] দাদুকে চিঠি দিয়ে সোজা আপনাদের কাছে চলে এসেছি। সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে খুলে জানিয়েছি। আপনাদের কাছে জবাব মেলে ভাল—নইলে, আবার আমায় দাদা-মশায়ের শরণাপন্ন হতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, বিষকুম্ভ লোকটা কে বলতে পার অরুণ? কাগজপত্র আমি তো সমস্ত ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে লোকটা এত খবর পেল কোথা থেকে? কাগজপত্র আর কাউকে তুমি দিয়ে দাও নি তো?

অরুণ। আজ্ঞে না।

ইরা। সত্যি, বিষকুম্ভ লোকটা ভারি বজ্জাত। কাশীশ্বরের দোষে একেবারে আপনাকে পর্যন্ত জড়িয়ে গালাগালি করেছে। লোকটার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না কি?

বিশ্বেশ্বর। অরুণ কি করে জানবে? লোকটা আত্মগোপন করে ছদ্মনামে লিখেছে যে—

ইরা। তা বটে! কি অরুণ বাবু, আপনি জানেন না কিছু? আমি কিন্তু জানি।

বিশ্বেশ্বর। তুই জানিস? কৈ, আমাকে বলিস নি তো! আসল নাম কি তার? থাকে কোথায়?

সরমা পুনরায় প্রবেশ করলেন।

ইরা। বেশি দূর যেতে হবে না বাবা। সে শান্ত মানুষটি তোমার কাছেই বসে আছেন।

বিশ্বেশ্বর। [সবিস্ময়ে] কি বলছিস তুই? যুগচক্রের লেখাটা অরুণ লিখেছে? তাই কখন হতে পারে?

সরমা। যা বলেছ! ওদের বংশ ধরে গালিগালাজ ও লিখতে যাবে কেন?

বিশ্বেশ্বর। ঠিক বলেছ। ইতিহাসে অরুণের ভারি নিষ্ঠা। ও লেখে তো ইতিহাসই লিখবে। গালিগালাজ লিখতে যাবে কেন?

ইরা। আক্রোশ থাকলে লেখে বাবা।

বিশ্বেশ্বর। আক্রোশ? কার উপরে আক্রোশ?

ইরা। তোমার এই দাম্ভিক মেয়ের উপর। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ছুরি মেরেছেন নিজের সর্বাঙ্গে। আমাদের জব্দ করেছেন।

কেঁদে ফেলল।

অরুণ। তা নয় ইরা দেবী। আমি যে ইতিহাসের ছাত্র—সত্য উদ্ঘাটন আমার কাজ। বুঝলেন তো এবারে, বংশের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য আমি কাগজপত্র নিইনি।

ইরা। তাই বলে এত গালিগালাজ?

অরুণ। অন্য কারণও ছিল। আবার নমিনেশনের কথা উঠছিল। তার সঙ্গে আসছিল প্রতুল দত্তের ভাগনী সুনন্দা। কলঙ্কের ঢাক পিটিয়ে নমিনেশন বন্ধ করে দিলাম।

অদূরে গোবিন্দভূষণ ঘোষ বলে ওঠেন—

গোবিন্দ। সহদেবের মুখে শুনলাম সরকার মশাই, ভায়া এখানে এসেছে। তাই ছুটে এলাম।

গোবিন্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে ইরা ও সরমা ভিতরে চলে যান।

বিশ্বেশ্বর। আসুন, আসুন। (অরুণ গোবিন্দকে প্রণাম করে)। আমার পরম সৌভাগ্য।

অরুণ গোবিন্দকে প্রণাম করে।

গোবিন্দ। এস ভাই। এস।…তা তুমি এখন বাড়ি যাও ভায়া। সরকার মশায়ের সঙ্গে কাজের কথা আছে। সেরে নিয়ে যাচ্ছি।

অরুণ চলে গেল।

গোবিন্দ। আসুন সরকার মশায়, বসুন। পরামর্শ আছে। আমার মা ঠাকরুনকেও ডাকুন।

বিশ্বেশ্বর। ওগো, শুনছ? এদিকে এস একবার।

সরমা এলেন। তাঁকে দেখে গোবিন্দ বললেন :

গোবিন্দ। বলছিলাম কি মা, আশীর্বাদটা এখনই সেরে যাব।

সরমা। এখনই?

গোবিন্দ। হ্যাঁ। বিয়ের আগে অবশ্য শাস্ত্রসম্মত ভাবে আশীর্বাদ হবে। এখন শুধু গিন্নির হাতের এই বালাজোড়া আমার নাতবৌয়ের হাতে পরিয়ে দিতে চাই। এ মাসে বিয়ের আর মাত্র দুটো তারিখ। একটা কাল; আর একটা মাসের শেষে। গেরোর কথা কিছু বলা যায় না। তাই শুভ কাজটা একটা তারিখ হাতে রেখে কালই সেরে ফেলতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। আমার অবস্থা তো জানেন। এক রাত্রের মধ্যে বিয়ে হয়ে উঠবে কি?

গোবিন্দ। ওর জন্যে ভাববেন না, আমি সব ভার নিচ্ছি। শুধু মা-ঠাকরুনকে একটু হাতে-হাতে করে নিতে হবে। আর কোন কথা নয়। যান, আমার নাতবৌকে নিয়ে আসুন।

সরমা বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেন।

বিশ্বেশ্বর। ভাবছ কি? নিয়ে এস ইরাকে। ঘোষমশায় সব ভার নিচ্ছেন, তখন আর কি!

গোবিন্দ! ভার নিচ্ছি বই কি! সব ভার আমি নিলাম।

সরমার প্রস্থান।

গোবিন্দ। পাত্রপক্ষ আর কন্যাপক্ষ—দু-পক্ষেরই ভার নিচ্ছি। না নিয়ে আর উপায় নেই। ভায়া আমায় চিঠিতে লিখেছে, এইখানে যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতে পার, ভাল। নইলে বিবাগী হয়ে চলে যাব। আজকালকার ছেলে, বুঝতে পারছেন তো সরকার মশায়।

বিশ্বেশ্বর। [হেসে] হা-হা, তা যা বলেছেন !

সরমা ইরাকে নিয়ে এলেন। ইরা গোবিন্দকে প্রণাম করে।

গোবিন্দ। বস দিদি, বস। [বালা দুটো হাতে পরিয়ে] শাঁখও বাজল না, উলুও পড়ল না। শুধু—

বিশ্বেশ্বর। তা না পড়ুক, তবু রয়েছে আমাদের সকলের অন্তরের আশীর্বাদ—

গোবিন্দ। সুখী হও দিদি, সুখী হও। [বিশ্বেশ্বরের প্রতি] শুনুন সরকার মশাই, বিয়ের সব কাজ আমি এখান থেকে সেরে যাব। শুধু ফুলশয্যা আর বৌভাত আমার সাতবেড়ের বাড়িতে হবে।

বিশ্বেশ্বর। তা বেশ তো!

সরমা। আপনি উঠবেন না। একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।

গোবিন্দ। ওটা কাল হবে মা! এখন মিষ্টি সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে

আমায় পুরুতবাড়ি ছুটতে হবে। না না, এর জন্য ব্যস্ত হবেন না। কাল পাত পেড়ে মিষ্টিমুখ করব।

প্রস্থান। সরমা ও বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকেন। বিশ্বেশ্বর তারপর অশ্রুসজল চোখে বলেন—

বিশ্বেশ্বর। ছেলেবয়সে মা হারিয়েছিলাম। বুড়ো বয়সের মা-টিও এবার নিজের সংসারে চলল। কে আর আমার খবরদারি করবে বড়বৌ? কে আর আমায় ঝগড়াঝাটি করে খাওয়াবে?

কেঁদে ফেললেন। সরমা বলেন—

সরমা। ওগো, সংসারে এসে এই তো করতে হয়। এত বড় পণ্ডিত মানুষ হয়ে শুভকাজে চোখের জল ফেল কেন এমন?

বিশ্বেশ্বর। জানি না, কেন আজ দু-চোখ দিয়ে এত জল গড়াচ্ছে। বাধা মানছে না। ইরা আজ আমায় সব দিক দিয়ে মুক্ত করে মুক্তি-সাগরের বন্যা নামিয়েছে দুচোখে! আমি অক্ষম বাপ—ওর বিয়েয় কোন সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ক্ষমতা আমার নেই। শূন্য হাতে ওকে আমি আশীর্বাদ করছি বড়বৌ। ও সুখী হোক—ও সর্বসুখী হোক—

ষষ্ঠ দৃশ্য

সিরাজকাটির ডাকবাংলো। শেষ রাত্রি। ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের সাড়াশব্দ নেই। একখানি গরদের শাড়ি বারান্দায় মেলে দেওয়া। প্রবল বর্ষণের পর থমথমে ভাব। বাংলোর আশেপাশে চারা-গাছগুলো জলে ভেজা। গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ সোল্লাসে ডেকে চলেছে। জনৈক ড্রাইভার—তার কাঁধে দুটো সুটকেশ। টর্চের আলো ফেলে সে ইরা ও অরুণাকে বাংলোর বারান্দায় এনে তুলল। জলে ইরার কাপড়চোপড় ভেজা; অরুণের হাতে জুতা। সুটকেশ দুটো বেঞ্চির উপর নামিয়ে ড্রাইভার বলে—

ড্রাইভার। এ কি, কাপড় ঝুলছে! বৃষ্টিজলের জন্যে কেউ নিশ্চয় ঘরে এসে উঠেছেন।

অরুণ। হ্যাঁ, ঘরে লোক আছে।

ড্রাইভার। যা হোক করে এই বারান্দায় কোন রকমে রাতটুকু কাটিয়ে দিন।

ইরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিব্যি জায়গা। বেশ হবে।

ড্রাইভার। এবার আমায় বিদেয় করুন বাবু। আধক্রোশ পথের জলকাদা ভেঙে আবার আমায় গাড়ির কাছে যেতে হবে।

অরুণ ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দেয়। ড্রাইভার টাকা নিয়ে চলে গেল।

ইরা। খাসা জায়গা পাওয়া গেছে। আর কি, শুয়ে পড়ি এবার।

ইরা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে।

অরুণ। ওই ভিজে-জবজবে কাপড় নিয়ে শুয়ে পড়লে! ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধরে, এটুকু বুদ্ধিও নেই?

ইরা। বুদ্ধি থেকে কোন লাভ নেই। কাপড়-চোপড় সবই তো ভিজে গেছে। উপায় কি বল?

অরুণ। উপায় যা হোক একটা-কিছু করতেই হবে। বুদ্ধি থাকলে উপায় বের করা যায়।

বারান্দার মেলে-দেওয়া কাপড়টা নিয়ে এসে বলে—

ভিজে কাপড় ছেড়ে এটা পরে নাও।

ইরা। [চাপা গলায়] করছ কি? যাঁরা ঘরে আছেন, এ তাঁদের কাপড়।

অরুণ। হলই বা! নিজের কাপড়টা মেলে দিয়ে এটা পরে থাক। তোমার কাপড় এরমধ্যে শুকিয়ে যাবে। ওঁরা উঠে পড়বার আগেই আবার যেথানকার কাপড় সেথানে মেলে রেখে দিও।

ইরা। না না, ও আমি পরব না। পরের কাপড় পরতে আমার ঘেন্না করে।

অরুণ। জলকাদা-মাখা নোংরা কাপড় পরে আছ, তাতে ঘেন্না

নেই ? এতো দিব্যি গরদের শাড়ি। আসল কথা, আলসেমি করে ছাড়বে না তাই বল।

ইরা। বাপরে বাপ, এখন থেকেই শাসন শুরু করলে? দাও।

ইরা উঠে দাঁড়ায়। অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে কাপড় নেয়। কাপড় নিয়ে পিছন দিককার বারান্দায় চলে গেল। অরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে। ইরা কাপড় বদলে এল। অরুণ বলে—

অরুণ। দেখ, একটা কথা তোমায় বলা হয় নি। আমি কিন্তু এক কাণ্ড করে বসে আছি।

ইরা। আবার কি কাণ্ড করলে?

অরুণ। এ-মাসে মাত্র দুটো তো বিয়ের দিন ছিল?

ইরা। হ্যাঁ—

অরুণ। একটা পরশু গেছে। আর একটা মাসের শেষে। আমি মিথ্যে বলে মাকে শেষের তারিখে বিয়ে হচ্ছে বলে জানিয়েছি।

ইরা। ছিঃ ছিঃ, মিথ্যে কেন লিখলে?

অরুণ। না লিখে উপায় ছিল না। যুগচক্রের কথা কি ভুলে গেলে? নয়তো বাবা এসে পড়ে নিশ্চয় বিয়ে পণ্ড করে দিতেন। থাকগে, এখন ভেবে লাভ নেই।…এবার একটু গা গড়িয়ে নাও। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ভোর হলেই আমি একবার গাঁয়ের ভিতরে পাল্কির সন্ধানে যাব। ঘুম থেকে উঠে যদি না দেখতে পাও, তা হলে যেন ঘাবড়ে যেও না।

ইরা। না গো, না। আমি হলাম ডাকসাইটে ঝগড়াটে। ঘাবড়াবার মেয়ে আমি নই।

ইরা মুড়িসুড়ি দিয়ে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল। অরুণ সিগারেট টানতে লাগল। ক্রমশ ভোর হয়ে যায়। বাংলো ছেড়ে অরুণ আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে। ঘরের ভিতরে কথাবার্তা চলছে।

অম্বুজ। ওগো শুনছ? সিগারেটের টিনটা কোথায়?

সুহাসিনী। তোমার সিগারেট কোথায়, তা আমি জানব কি করে?

অম্বুজ। আহা, তুমি মনে করে এনেছিলে তো?

ইরা ধড়মড় করে উঠে বসে। কান পেতে কথাবার্তা শুনছে।

সুহাসিনী। যে-মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তাতে কি আর তোমার সিগারেটের কথা খেয়াল থাকে?

অম্বুজ। তা থাকবে কেন! কিন্তু তুমি পানদোক্তা খেতে, তখন আমি পানই খেতাম না। শেষটা তোমার খাতিরে দোক্তা পর্যন্ত অভ্যাস করে ফেললাম।

সুহাসিনী। ওঃ! তাহলে বলতে চাও, সিগারেটটা অভ্যাস করে নিলে তোমার আজ আর এই অসুবিধে হত না।

অম্বুজ। কি করব বল? সকালবেলা ধোঁয়া না হলে যে মনটা খিঁচড়ে যায়।

পাশের দরজা খোলার আওয়াজ ইরার কানে যায়। সুহাসিনী দরজা খুলে বাইরে এসে বলেন:

সুহাসিনী। ওগো! কাপড়খানা চুরি হয়ে গেছে।

অম্বুজ। যাবেই তো! বললাম, চোরছ্যাঁচড়ের দেশ। ঘরে শুকোতে দাও। তা আমার কথা শুনলে না তো!

যেদিকে ইরা, সুহাসিনী সেই দিকে আসছেন। তাঁকে দেখে ইরা জড়সড় হয়ে যায়।

ইরা। সর্বনাশ!

সুহাসিনী। তুমি কে বাছা?

ইরা। [উঠে দাঁড়িয়ে] এক জায়গায় যাচ্ছিলাম আমরা। বৃষ্টিতে পথঘাট সব ভেসে গেছে। তাই এখানে আশ্রয় নিয়েছি। আপনাদেরই মতো।

ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। তোমায় চিনিনে জানিনে, কোন জাত-টাত কি বৃত্তান্ত তার ঠিকঠিকানা নেই, গরদের কাপড় পরে দুর্গা ঠাকরুনটি সেজে আছ কোন বিবেচনায় শুনি ?

ইরা। জাতে অবশ্য আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু গরদ-তসর তো ছোঁয়াছুয়িতে নষ্ট হয় না বলেই শুনেছি।

ঘরের ভিতর থেকে অম্বুজাক্ষ বেরিয়ে এলেন।

অম্বুজ। কাপড় পেয়ে গেছ ? কার সঙ্গে কথা বলছ গো ?

সুহাসিনী। ও কাপড় ছুঁতে আমার বয়ে গেছে। জলকাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ইরা। আপনাকে জলকাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে না।

ব্যাগ খুলে খানকয়েক নোট বের করে সুহাসিনীর সামনে ধরে বলে—

নিন আপনার কাপড়ের দাম। আমি পরে নষ্ট করে ফেলেছি, দাম দিয়ে দিচ্ছি। বলুন, ক'টাকা দাম লাগবে ?

অম্বুজ। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। অন্যায় করবে আবার চোখ রাঙাবে—দুটো কখনও একসঙ্গে হয় না।

ইরা। অন্যায় করিনি আমি। কখনও নয়।

অম্বুজ। না বলে পরের জিনিস নিয়েছ। এটা বুঝি খুব ন্যায়-সঙ্গত কাজ ?

ইরা। দরজায় খিল এঁটে আপনারা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। বলি কেমন করে? আর রাতদুপুরে জলে ভিজে তখন আমি হি-হি করে মরছি। [কাঁদ-কাঁদ হয়ে] ঐ রকম ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়া হত—তাই থাকা আমার উচিত ছিল, বুঝতে পারি নি।

অম্বুজ। বললাম যে সকালবেলা ধোঁয়া না হলে মন খিঁচড়ে যায় বলি, হল তো?

ইরা স্যুটকেশ খুলে সিগারেটের কৌটা দিয়ে বলে—

ইরা। এই নিন। এবার বসে বসে মন ঠাণ্ডা করুন গিয়ে।

অম্বুজ। বা বা, বাঁচালে! এই এক বেয়াড়া অভ্যেস—

সিগারেট ধরালেন।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর ঘর করেও তোমায় হুঁস থাকে না—আর একফোঁটা মেয়ের বিবেচনাটা দেখ। (ইরার প্রতি) তা তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছেন মা? মানে, আর কাউকে দেখছি না কিনা!

ইরা। উনি পাল্কির খোঁজে বেরিয়েছেন। কাল রাতে আমাদের ট্যাক্সিটা পথের মাঝে খারাপ হয়ে গেল। মাঠের ধারে ট্যাক্সিখানা এখনও জল খাচ্ছে।

অম্বুজ। [হেসে উঠে] বা বা, বেশ বলেছ মা! তুমি তো খাসা কথা বল। বুদ্ধি-বিবেচনাও চমৎকার! তা মাঝে মাঝে তোমার অমন মেজাজ বিগড়ে যায় কেন মা? মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা কোরো। বুঝলে মা, তা হলে সুখে থাকবে।

সুহাসিনী। তুমি আর উপদেশ দিও না। মুখের উপর যে টাকা ছুঁড়ে দিতে আসে সে আবার মেজাজ কম করবে! শুধু শুধু সাত-সকালে শতেক অপমান সইতে হল।

ইরা। [স্যুটকেস দুটো হাতে নিয়ে] আর অপমান সইতে হবে না আপনাদের। আমি যাচ্ছি ওদিকটায়। আপনারা এখানে থাকুন।

চলে গেল।

সুহাসিনী। কী তেজি মেয়ে রে বাবা! রাগে যেন মটমট করছে।

অম্বুজাক্ষ সুহাসিনীর কথায় হেসে ওঠেন। এই সময়ে বাংলোর সামনে দিয়ে সহদেবকে ব্যস্তভাবে যেতে দেখে অম্বুজাক্ষ ডাক দেন—

অম্বুজ। ওহে ও সহদেব! শোন শোন! আরে, ওদিকে কোথায় চললে?

সহদেব এসে প্রণাম করল।

কোথায় চলেছ এত ব্যস্ত হয়ে?

সহদেব। আজ্ঞে, ঘোষ মশাই আমায় সাতবেড়েয় নিয়ে গেলেন ফুলশয্যা আর বৌভাতের ব্যবস্থা করার জন্যে। তাই—

অম্বুজ। সেকি! বিয়ে তাহলে হয়ে গেছে?

ইরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সহদেব। আজ্ঞে হ্যাঁ। পরশুদিন হয়ে গেল। কাল রাত্রে বরকনে ফেরার কথা। কিন্তু সারারাত জলবৃষ্টির জন্যে বরকনে ফেরেনি, ঘোষ মশায় তাই ব্যস্ত হয়ে আমার সঙ্গে পাল্কি-বেহারা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ফুলশয্যা-বৌভাত আজকে।

অম্বুজ। ও! আমাদের চিঠিতে অরুণ মিথ্যে করে লিখেছে—বিয়ে আসছে মঙ্গলবার। কুকুর-বিড়ালের সামিল ভেবেছে আমাদের। [সুহাসিনীর দিকে চেয়ে চিৎকার করে] ও ছেলে কখনও যেন আমার বাড়িমুখো না হয়। বেশ ভাল করে সমঝে দিও সহদেব। যে আমার বংশ ধরে গালাগালি দেয়, আমায় অমতে তার মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। বাড়ি গেলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেব। চল, তোমার আর বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না। এখান থেকে সোজা আমরা কলকাতায় চলে যাব।

সহদেব। কলকাতা চলে যাবেন? কিন্তু ইলেকশনে নাম দেবার সময় হয়ে গেছে। শুনলাম, সাধনবাবু কাগজপত্তর নিয়ে সদরে চলে গেছেন।

অম্বুজ। ইলেকশনে আমি দাঁড়াচ্ছিনে। সাধন এমনিতে হয়ে যাবে।

ইরা। দাঁড়াবেন না কেন?—কেন?

অম্বুজ। দাঁড়াই না দাঁড়াই, সে আমি বুঝব।...তুমি কে?

ইরা। [সভয়ে] আ—মি, আ—মি—

সহদেবের মুখের দিকে তাকাল।

সহদেব। ইনিই তো আপনার পুত্রবধূ—

অম্বুজ। এঁ্যা?

ইরার দিকে তাকালেন। ইরা অম্বুজাক্ষকে প্রণাম করে।

ইরা। কাশীশ্বর সেকালে কি করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা মাথা-ফাটাফাটি করুন গে। কিন্তু মণিরামপুরের লোক কানা নয় বাবা। এ-কালে তারা চোখের উপর দেখল গরিবের এই ঝগড়াটে মেয়েটার দায় উদ্ধার করে আমার মা-বাপের কত বড় দুর্ভাবনা আপনারা ঘোচালেন।

ইরা সুহাসিনীকে প্রণাম করল। সুহাসিনী ইরাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন:

সুহাসিনী। কে বলে তুমি ঝগড়াটে? খবরদার বলছি! আমার বৌয়ের তুমি নিন্দে করবে না।

ইরা। আপনি বুঝিয়ে বলুন মা, ইলেকশনে না দাঁড়ালে আমার বাবার নামে দোষ থেকে যাবে।

অম্বুজ। না না, দোষ থাকবে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে সব দোষ আমার সকল সঙ্কোচ তুমি খণ্ডে দিয়েছ মা। দাঁড়াব, আমি ইলেকশনে নিশ্চয় দাঁড়াব। এতদিন পরে কাশীশ্বরের কলঙ্কের সত্যি সত্যি মোচন হল রামনিধির বংশের মেয়েকে ঘরে এনে। নতুন দিনের আলোয় মানুষের আজ এবার নতুন করে বিচার হবে।

হাসিনী। [হিরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে] তা না হয় হবে। কিন্তু আজকে ফুলশয্যা, বৌভাত। এখানে বসে তো আর সময় নষ্ট করা যায় না!

অম্বুজ। বটেই তো! সহদেব, তুমি এক কাজ কর—

সহদেব। বলুন।

অম্বুজ। শ্বশুর মশায় যে পাল্কি পাঠিয়েছেন, তারা পিছনে আসছে?

সহদেব। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা এসে পড়ল বলে।

অম্বুজ। বেশ! তা হলে সেই পাল্কি করে শাশুড়ি-বৌকে সাতবেড়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

অরুণের প্রবেশ।

এই যে! পাল্কি পেয়েছিস? কি, চুপ করে রইলি কেন? হ্যাঁ-না যা হোক একটা কিছু বলবি তো?

অরুণ। [ভয়ে ভয়ে] বেহারারা এবেলা ক্ষেতের কাজে চলে গেল। ও-বেলার আগে তারা আসতে পারবে না।

অম্বুজ। অতক্ষণ দেরি করা চলবে না। হেঁটেই যাব।

অরুণ। জলকাদা ভেঙে এতখানি পথ আপনি কি—

অম্বুজ। কেন? তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? আমি বুড়োমানুষ যদি হেঁটে যেতে পারি, তুমি নবাবনন্দন এইটুকু পথ হেঁটে যেতে পারবে না?

অরুণ। [ইতস্তত করে] আজ্ঞে তা নয়। তবে—

অম্বুজ। এর মধ্যে আর তবে নেই। যেতেই হবে এখনি। তোমার বুদ্ধির দোষে ডাকবাংলোয় আমায় শূন্যহাতে বৌমার মুখ দেখতে হল। ফুলশয্যা-বৌভাতও এই ডাকবাংলোয় সারতে বল নাকি? চলে এস আমার সঙ্গে।

—যবনিকা—